KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং রমিস লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 5/6 5/7-8 5/9 5/10 5/11 5/12	Year of Publication : আশ্বিন ১৩২৫ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫ মাঘ ১৩২৫ ফাল্গুন ১৩২৫ চৈত্র ১৩২৫
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুর পত্র।

—ঃ০ঃ—

৺চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজীবন পত্রব্যবহার ছিল। এই পত্রযোগে পরস্পরের ভিতর বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা চল্‌ত। বসু মহাশয়ের পত্রে প্রকাশ, তিনি সাহিত্যসেবীদের মধ্যে এইরূপ literary correspondence-এর প্রচলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আজ ৩৪ বৎসর পূর্ব্বের লেখা বসু মহাশয়ের দু'খানি পত্র প্রকাশ কর্‌ছি—এর থেকে সেকালে কি ভাবে সাহিত্য আলোচনা করা হ'ত তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

সম্পাদক।

(১)

কলিকাতা
৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পড়িয়া আমি বড়ই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আমি যাহাদিগকে সকৃতজ্ঞ-চিত্তে সম্মান করি, তাঁহারা আমাকে স্নেহ করেন ইহা বুঝিতে পারিলে আমি যথার্থই সুখী হই।

সাহিত্য ক্ষেত্রে আমি আপনাকে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে নিষেধ করি না—সাহিত্য ক্ষেত্রে যুদ্ধবিগ্রহ বড় আবশ্যক। সঞ্জীবনীতে আপনি আমার পত্রের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়াও আমি দুঃখিত হই

নাই। আমি যথার্থই * * বাবুকে গালি দিয়াছি, পাছে আপনারা এইরূপ মনে করিয়া থাকেন—এই ভাবিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। আপনার সুধাময় পত্রপাঠে সে ব্যথা নিবৃত্ত হইয়াছে।

আমার কোন লেখা আপনি কখনও কোন লোকের কাছে নিন্দা করিয়াছেন, এ কথা আপনার পত্রে প্রথম জানিলাম, আগে জানিতাম না। অতএব সেরকম নিন্দার কথা শুনিয়া আমি ব্যথিত হই নাই। আপনার লিখিত একটি প্রবন্ধে আমার নিন্দা দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আপনি যখন সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন সে প্রবন্ধের কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আর ব্যথিত করিব না।

লোকের কাছে মুখে মুখে সমালোচনার কথা যখন উঠিল, তখন আমার একটা সামান্য মত প্রকাশ করি। আমার বোধ হয় যে, আমাদের পরস্পরের গ্রন্থ শুধু ছাপায় সমালোচিত না হইয়া পরস্পরের মধ্যে চিঠিতে সমালোচিত হওয়া ভাল। বন্ধুর গ্রন্থ সম্বন্ধে বন্ধুকে মত জানাইতে হইলে যে শুধু প্রশংসাই করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; বরং বন্ধুভাবে বন্ধুকে মত জানাইতে বন্ধুর লেখার দোষগুলির প্রতিই বেশী লক্ষ্য থাকা সম্ভব এবং উচিত। লেখার গুণ এবং দোষ, এ দু'য়ের মধ্যে গুণ জানা খুব আবশ্যক,—কিন্তু দোষ জানা তদপেক্ষা বেশী আবশ্যক। ছাপার সমালোচনায় কি গুণ, কি দোষ, কিছুই ভাল করিয়া বুঝান হয় না. অথচ দোষগুলি অতি অযথা প্রণালীতে গাহিয়া দেওয়া হয়, প্রায়ই রুক্ষ এবং অভদ্র ভাষায় বলিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে যাঁহার দোষের উল্লেখ করা হয়, তাঁহার দোষগুলি হয় দোষ বলিয়া মনে হয় না, নয় সমালোচনার ব্যবহার দেখিয়া

তাঁহার কথিত দোষগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিয়া তাহার সংশোধন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বন্ধুভাবে চিঠিতে সমালোচনা হইলে এ সকল কুফল ফলে না। কারণ, সেরকম সমালোচনা প্রথমতঃ যত্নসহকারে করিতে হয়, অতএব সমালোচনা বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ, সে সমালোচনা ভদ্রভাবে এবং সহানুভূতির সহিত লিখিত হওয়ায়, যাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা তাঁহারও তাহাতে আস্থা হয়, এবং সমালোচনা ঠিক বোধ হইলে তদনুসারে নিজের দোষ সংশোধন করিতে প্রবৃত্তি, যত্ন এবং চেষ্টা হয়। এবং এই প্রণালীতে সমালোচনা করিতে করিতে আমাদের সাহিত্যের, বিশেষত সমালোচনা-সাহিত্যের (Critical literature-এর) ভাবভঙ্গী ভদ্রোচিত এবং সম্মানার্হ হওয়া সম্ভব। কিন্তু আমি দেখিয়া বড় দুঃখিত যে, আমাদের মধ্যে এই প্রণালীর সমালোচনার জন্য কাহারও বড় একটা স্পৃহা নাই। আমাদের মধ্যে বন্ধু বন্ধুকে বই উপহার দেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর মতের বা সমালোচনার কামনা করেন না। বোধহয় কেবল প্রশংসার তৃষ্ণা প্রবল বলিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে প্রধান লেখকেরা সমালোচনাকে বেশী ভয় করেন। আমি অনেক দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছি, আমরা বড়ই অপদার্থ। কিন্তু আমি যে প্রণালীর সমালোচনার কথা লিখিলাম, সে প্রণালী প্রচলিত হইলে সমালোচনাটা ক্রমে গা-সওয়া হয় না? এবং মোটের উপর আমাদের খুব উপকার হয় না? বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে প্রকৃত literary correspondence নাই বলিয়া আমার বোধ হয়।

বিনীত

(স্বাঃ) শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

(২)

কলিকাতা,
৯ অক্টোবর, ১৮৮৪।

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্কিম বাবুর আধুনিক গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে আপনি আমার মত জানিতে চাহিয়াছেন। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি সেইরূপ বলিতেছি।

* * * * *

তারপর দেবী চৌধুরাণীর কথা। দেবীর সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। কিন্তু আপনাকে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যেন আপনি একটু ভুল বুঝিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন—দেবী চৌধুরাণী কেমন করিয়া ডাকাইত হইল, কেমন করিয়া ডাকাইতি করিল?—কিন্তু দেবী চৌধুরাণী ত ডাকাইতি করে নাই। ডাকাইতের সঙ্গে ঘুরিত ফিরিত বটে, কিন্তু কখনও ডাকাইতি করে নাই। ডাকাইতের দলকে উৎসাহিত, চমকিত এবং আবদ্ধ রাখিবার জন্য ভবানী পাঠক দেবীকে রাণী সাজাইয়াছিল, কিন্তু দেবী ডাকাইতি করিত না। তবে দেবী ডাকাইতের দলের রাণীগিরি করিয়া, স্বয়ং ডাকাইতি না করিলেও ডাকাইতিকে প্রশ্রয় দিয়াছে, এরূপ তর্ক করা যাইতে পারে। কিন্তু গোড়ায় ভবানী পাঠক দেবীকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে তাহার ডাকাইতি, ডাকাইতি নয়—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন মাত্র। দেবী তখন সেই

কথা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছিল। এরূপ বুঝা নিতান্ত অসম্ভব, অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। অতএব দেবীর ডাকাইতের দলে থাকা বড় একটা বিচিত্র নয়। কিন্তু ডাকাইতের দলে থাকা দোষের নয়, এরূপ বুঝিয়াও দেবী স্বয়ং ডাকাইতি করে নাই, করিতে পারে নাই। ইহাতে নারীচরিত্রের সঙ্গতিই রক্ষিত হইয়াছে, অসঙ্গতি ঘটে নাই। ডাকাইতের দলে থাকিয়া দেবী তাহার দৈব-লব্ধ প্রভূত অর্থ গরিব দুঃখীকে দান করিয়া বেড়াইত। ইহাও স্ত্রী-স্বভাবসঙ্গত। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি দুই একটি স্ত্রীলোক স্বামীর বিষয় পাইয়া তাহা গরিব দুঃখীকে দিয়া কাঙ্গালিনী হইয়াছে। তারপর রাণীগিরি করা। সেটা কিন্তু তাহার মনোগত নয়। গল্পটি পড়িলে এ কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দেবীর রাণীগিরি করা তাহার মনোগত নয়, কেবল ভবানী পাঠকের অনুরোধে তাহা করিত। ভবানী পাঠকের প্রয়োজন সাধন হইয়া গেলেই রাণীগিরি ছাড়িয়া কাঙ্গালিনী সাজিত। ভবানী পাঠক তাহাকে বড় বিপদ হইতে রক্ষা করে, তাহাকে অনেক যত্নে শিক্ষা দান করে, তাহাকে বড়ই ভালবাসে এবং ভক্তি করে। সেও ভবানীকে পরম গুরু বলিয়া ভক্তি করে। অতএব ভবানী পাঠকের অনুরোধে তাহার এক আধবার রাণীগিরি করা বড় একটা অসঙ্গত কাজ নয়। অতএব দেবাকে আমি এমন কোন কাজ করিতে দেখি নাই, যাহার মূল তাহার "ভিতর" নাই, অথবা যাহা স্ত্রী-চরিত্রের সহিত সঙ্গত হয় না। দেবীর মাতৃ-গৃহ ত্যাগ হইতে শ্বশুরগৃহে পুনরাগমন পর্য্যন্ত তাহার জীবনপ্রণালীটা (Mode of life) অবশ্যই কতকটা masculine-রকম বোধ হয়। অত স্বাধীন ও সাহসিক ভাব পুরুষকেই সাজে, বাঙ্গালি স্ত্রী-কে সাজে না। কিন্তু প্রথম কথা এই যে,

দেবী জীবনের চিত্র নয়, আদর্শ চিত্র ; এবং সেই জন্য কবি দেবী-চরিত্রে এমন মশলা সংযোগ করিয়াছেন, যাহা বাঙ্গালি মেয়ের চরিত্রে থাকিলে ভাল হয়। একজন ইউরোপীয় স্ত্রী দেবীর মতন জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিলে বোধহয় তাহাতেও স্ত্রী-চরিত্রের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অর্থাৎ দেবীতে যে উপকরণ কবি যোগ করিয়াছেন, সে উপকরণ ইউরোপীয় স্ত্রী-চরিত্রে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সেই উপকরণ স্ত্রী-চরিত্রের একেবারে অনুপযোগী নয়। তাই, কবি বাঙ্গালি মেয়ের চরিত্রে সে উপকরণ থাকা স্পৃহনীয় বিবেচনা করিয়া দেবীর চরিত্রে সে উপকরণ সংযোগ করিয়াছেন। আনন্দ মঠের শান্তিতেও এরূপ করা হইয়াছে। অতএব আমার মতে, দেবীকে কবির ideal বা আদর্শ চরিত্র বলিয়া ধরিলে, দেবীর জীবনাংশটা বড় একটা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সেই জীবন-প্রণালী সম্বন্ধে আমি ইহাও বলি যে, সেরূপ জীবনপ্রণালী সাধারণত বাঙ্গালির মেয়ের পক্ষে অসম্ভব বা অসঙ্গত হইলেও, সকল বাঙ্গালির মেয়ের পক্ষে অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। রাণী ভবানীর কথা আমরা যেরূপ শুনিয়া থাকি, তাহাতে বোধ হয় যে রাণী ভবানীও আবশ্যক হইলে দেবীর জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিতে পারিতেন। দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যখন প্রফুল্লকে প্রথম দেখি, তখনও তাহাতে, এমনি সাহস, প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভর-শক্তির লক্ষণ দেখিতে পাই যে, তাহার পরে যখন তাহাকে ডাকাইতের দলে থাকিয়া প্রভুত্ব করিতে দেখি, তখন কিছুমাত্র বিস্মিত হই না। তখন যথার্থই বোধ হয়, এরূপ অবস্থায় সেই প্রফুল্ল যে এই দেবীরাণী হইয়া পড়িবে, ইহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নয়। অতএব দেবীতে হঠাৎ পরিবর্ত্তিত বা হঠাৎ

আরোপিত হইয়াছে, অথবা তাহার গোড়ার চরিত্রের সহিত অসঙ্গত হইতেছে, এমন কিছুই আমি দেখিতে পাই না।

তথাপি আমি বলি যে বঙ্কিমের আগেকার উপন্যাস আমাকে যত ভাল লাগিয়াছে, দেবী চৌধুরাণী তত ভাল লাগে নাই। তাহার কারণ দেবী চৌধুরাণীতে theory-র অবতারণা। দেবী অনেক সাহসের, অনেক বুদ্ধির, অনেক দয়ার কার্য্য করিয়াছে ; কিন্তু কবি যে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, ভবানী পাঠকের শিক্ষার গুণে দেবী সে সব কাজ করিয়াছিল, তাহাই কি ঠিক ? সে শিক্ষা না পাইলে দেবী কি সে সব কাজ করিতে পারিত না ? আমাকে বেশ পরিষ্কার বোধ হয় যে, দেবী এমন কোন কার্য্য করে নাই—যাহা করিবার জন্য তাহার বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। আমি গল্পের গোড়াতেই দেবীতে যে সকল মশলা দেখিতে পাই, সে সকল মশলার গুণে দেবীকৃত সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়, বিশেষ শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। শিক্ষার কথাটা এত করিয়া লিখিবার ফল এই হইয়াছে যে, দেবী যা কিছু করিতেছে তাই যেন সেই শিক্ষার গুণে করিতেছে, তাই যেন সেই শিক্ষার demonstration মাত্র, এরূপ মনে হয়। দেবী রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—কোন পক্ষে একটিও মানুষ মরে নাই, একটিও মানুষ আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই ? অমনি মনে হইতেছে যেন দেবী সেই নিষ্কাম ধর্ম্মের কসামাজা theory বজায় রাখিতেছে। অনেক স্থলে এইরকম মনে হয়। দেবীকে শিক্ষার অধীন না করিলে, এবং কথায় কথায় নিষ্কাম ধর্ম্মের নিক্তি তুলিয়া না ধরিলে, দেবীর কোনও কার্য্যের বিবরণ পড়িয়া ক্ষুব্ধ হইতে হইত না—কোনও কার্য্যই unspontaneous বলিয়া বোধ

হইত না। দেবীর সকল কার্য্যই তাঁহার চরিত্রের অনুরূপ এবং সেই-জন্য বড়ই প্রীতিকর। কেবল এক শিক্ষার কথা এবং নিষ্কাম ধর্ম্মের ধুয়া তুলিবার দরুণ, সেই সকল চমৎকার কার্য্যের বিবরণ অনেকাংশে পূর্ণানন্দ প্রদানে অসমর্থ হইয়াছে। কিন্তু কোন কার্য্যই আমার অসঙ্গত, অস্বাভাবিক বা অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। আমার বোধহয় যদি ভবানী পাঠকের শিক্ষাপ্রণালীর উল্লেখমাত্র না থাকিত, এবং গল্পের মধ্যে নিষ্কাম ধর্ম্ম এই শব্দ পর্য্যন্তও ব্যবহৃত না হইত, তাহা হইলে দেবী চৌধুরাণী শুধু বাঙ্গালা সাহিত্যের নয়, মনুষ্যের সাহিত্যের একখানি চমৎকার রত্ন হইয়া থাকিত। গল্পের তবে তাৎপর্য্য উৎসর্গপত্রে ইঙ্গিতে লক্ষিত হইলেই বেশ সুন্দর হইত।

সীতারামে আমি এমন কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে আমার আরো অনেক আছে। দরকার হয় পরে বলিব। ইতি

বিনীত
(স্বাঃ) শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

পত্র।

—:*:—

শ্রীমান্ চিরকিশোর

কল্যানীয়েষু।

আমার শেষ চিঠি পড়ে, তুমি চম্‌কে না যাও, চমৎকৃত যে হয়েছ, সে কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি নে। পত্রখানি যে আগাগোড়া পড়্‌তে পেরেছ, এই আমার সৌভাগ্য। তুমি জিজ্ঞাসা করেছ—ইউক্লিড পরমতত্ত্ব নয়, চরম আর্ট—একথা বলে আমি কি বল্‌তে চেয়েছি? এপ্রশ্নের সহজ উত্তর—যা বল্‌তে চেয়েছি, তা ঐ পত্রের ভিতরেই আছে। মনে ভাব্‌তে পার, এ উত্তর হচ্ছে—চালাকি করে ও প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। আসলে কিন্তু তা নয়। লেখক কি সব সময়ে জানেন যে তিনি কি বল্‌তে চান? কলমের মুখ দিয়ে যে অনেক সময় এমন সব কথা বেরিয়ে যায়, যা বল্‌বার লেখকের কোনরূপ অভিপ্রায় ছিল না,—তা লেখকমাত্রেই জানেন। লিখ্‌তে বস্‌লেই দেখা যায়, কথায় কথা টানে, ভাব ভাবের পিছনে ছোটে, তারপর লেখা আপনা হতেই তার নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। সুতরাং সে মূর্ত্তির যদি কোনও মাথামুণ্ডু না থাকে, ত সে কলমের দোষ, লেখকের নয়। কবিকঙ্কন ভারতচন্দ্র প্রভৃতি যে বলেন যে সরস্বতী তাঁদের মুখে বাণী দিয়েছেন, সে কথা আমি বিশ্বাস করি। আমরা যাঁদের কবি বলি, তাঁদের মন যে ভাবসাগরে চিরদিন পাল খাটিয়ে অকূলের দিকে চলে, এ কথা যে না জানে, সে কাব্য কাকে বলে তা

জানে না। তবে অ-কবি আমরা, অবশ্য চিরদিন গুণ টেনেই চলি,—অর্থাৎ মাটির আশ্রয় ত্যাগ কর্‌বার আমাদের সাহসও নেই, শক্তিও নেই। ভাবের যাত্রা নিরাপদে সাঙ্গ করবার জন্য আমাদের মত সাহিত্যিকদের পক্ষে, নিরেট বস্তুজগতের উপর পা রেখে লজিকের সিধে পথ ধরে চলা ছাড়া আর উপায় নেই। সুতরাং আমি এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার কর্‌ছি যে, আমার গেল চিঠিতে আর যাই থাক্—কোনও প্রকাণ্ড সত্য নেই। তবে কি ওটি একটি প্রকাণ্ড রসিকতা?—তাও নয়, কেননা রসিকতা কখন প্রকাণ্ড হয় না। ইংরেজরাও জানেন যে 'Brevity is the soul of wit. ও একটা খামখেয়ালি লেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর ভিতর যদি কিছু থাকে ত,—মানুষের মন লজিকের পথ ছেড়ে দিলে কি ভাবে চলে, তারই পরিচয়। যদি বল লজিকের ধ্রুবপদ ছেড়ে খেয়ালের বেচাল ধরবার প্রয়োজন কি? তার উত্তর—গুণটানার দাসত্ব হতে অব্যাহতি লাভ কর্‌বার লোভ সকলের-ই মাঝে মাঝে হয়।

আমি জানি, এ কথার জবাব তুমি কি দেবে। তুমি বল্‌বে, ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দিনে, আইডিয়া নিয়ে খেলা করাটা কি সঙ্গত?—তোমরা যে আজকাল সব কাজেরই হাতে হাতে ফল পেতে চাও, সে কথা কে না জানে। এ ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক, কেননা আমাদের কোন কাজেরই ফল ফলে না। যাদের সুমুখে সময় ঢের আছে তারা মেওয়া ফলাতে চেষ্টা করুক—কিন্তু আমাদের বয়েসের লোকের সবুর সয় না, আর তা'তে করে শুধু মেজাজ বিগড়ে যায়। এ অবস্থায় মনের কথা লিখ্‌তে গেলেই তা মেজাজি লেখা হয়ে উঠ্‌বে। আর আমার মতে মেজাজি লেখার চাইতে খেয়ালি লেখা ঢের ভাল, কেননা ঢের বেশি নিরাপদ। যে লেখার মাথা-মুণ্ডু নেই—তার মুণ্ডপাত কেউ

কর্‌তে পার্‌বেন না, অতএব তার বিরুদ্ধে কেউ অস্ত্রধারণ কর্‌বেন না। অপর কিছু লিখ্‌তে গেলেই কলমধারীদের সঙ্গে আমার কাজিয়া বাধে। কেউ ডান গালে চাঁটি মারলে, বাঁ গালটি যে অমনি বাঁয়া করে দিতে হবে, এ মন্ত্রে আমি দীক্ষিত হই নি। আমাদের দেশে যাঁরা লেখনী ধারণ করেন, তাঁরা প্রায়ই দেখ্‌তে পাই লেখক না হয়ে সমালোচক হতেই ব্যস্ত। সংস্কৃত লৌকিক ন্যায়ে বলে, প্রদীপ দিয়ে ঘর আলো করাই সঙ্গত, চালে আগুন লাগিয়ে দেওয়া অসঙ্গত। সেকালের জনসাধারণ যে কথাটা জান্‌ত, একালের শিক্ষিত সমাজ তা ভুলে না গেলে, মনের প্রদীপের আমরা এর চাইতে সদ্ব্যবহার কর্‌তে পার্‌তুম। আমরা যে তা করিনে, তার কারণ—আমরা আলোর চাইতে আগুনকে চিনি বেশি। ফলে, যে কথায় মনে আলো ফেলে, তার চাইতে যে কথায় বুকে আগুন জ্বলে, এদেশে তার বাজার-দর ঢের বেশি। কাজেই বাজে কথা বক্‌তে হয়।

তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক্ যে, আমাদের পক্ষে এখন প্রধান দরকার হচ্ছে—প্রাণের তেজ বাড়ানো। আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের উত্তাপটা যে এখন subnormal—একথা আমিও অস্বীকার করি নে। তবে আলোর ভিতরে যে আগুন নেই, এ সত্য কোন্ হাতে ধরা পড়েছে? রক্তমাংসের হাতে ত নয়ই। রসিকতাকে পাঁচজনে এত নীচু নজরে দেখে কেন? লোকের বিশ্বাস হাসির আলোর গায়ে চমক আছে, কিন্তু তার অন্তরে কোনও শক্তি নেই; অর্থাৎ বিদ্যুতের অন্তরে বজ্র নেই। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে তাঁদেরি মত, যাঁরা যে বস্তু স্পর্শ কর্‌তে পারেন না তার গুণাগুণ মানেন না, কেননা জানেন না। আলোর দোষই এই যে, ও বস্তু মানুষের করতলগত

হয় না। তারপর রসিকতা ছেড়ে যদি সত্যকথা বল, তাতেও রক্ষে নেই। অমনি লোকে বল্‌তে সুরু কর্‌বে যে, সে কথা অপ্রিয়, এবং অপ্রিয় সত্য বলা শাস্ত্রে নিষেধ। এ নিষেধ আমিও মান্য করি। তবে সত্যের খাতিরে আমি বল্‌তে বাধ্য যে, সত্য প্রিয়ও নয়, অপ্রিয়ও নয়—তা শুধু সত্য। সত্যের প্রিয়তা অপ্রিয়তা নির্ভর করে শ্রোতার উপরে। যা একজনের কাছে প্রিয়, তা আর একজনের কাছে অতিশয় অপ্রিয় হতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। একালে যে কথা আমাদের জাতের আত্ম-গরিমা না বাড়ায়, সকলেই জানে যে, তা আমাদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়,—হো'ক না সে কথা ষোল-আনা সত্য। কিন্তু সেকালে ভারতবর্ষে আর্য্য নামক এক জাত ছিল—যাদের প্রকৃতি ছিল ঠিক আমাদের উল্টো। ভাসের নাটকে পড়েছি যে, উত্তরগোগৃহে শত্রুর দল রণে ভঙ্গ দেবার পর, রাজকুমার উত্তর ঘরে এসে শুন্‌লেন যে, দূতমুখে বিরাট-রাজের কাছে এই সংবাদ পৌঁচেছে যে, তাঁর বীরত্বেই সে যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে। ব্যাপার হয়েছিল অন্য-রূপ। সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন বৃহন্নলা, আর উত্তর শুধু রথের মধ্যে সাক্ষী-গোপাল হয়ে বসেছিলেন। উত্তর এই মিথ্যা-প্রশংসায় হৃষ্ট হওয়া দূরে থাক্, অতিশয় রুষ্ট হয়ে বিরাট-রাজের কাছে বলেন যে, এই মিথ্যা-খ্যাতি বিষের মত তার দেহ-মনকে দগ্ধ কর্‌ছে; কেননা যে সত্যসন্ধ, মিথ্যা-প্রশংসা তার কাছে যেমন অগ্রাহ্য, তেমনি অসহ্য। এই কথায় উত্তর যে মনোভাব প্রকাশ করেন, সে মনোভাব যে আর্য্য, তার পরিচয় আমরা ঐ একই নাটকে, দ্রোণের মুখেও পাই। দ্রোণ শকুনীকে বলেন যে, সত্যের অপলাপ করা গান্ধার দেশের লোকের ধর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু আর্য্যের নয়। সে যাই হো'ক, একালের সাহিত্যে

রসিকতার চাইতে সত্যকথা যে বেশি অচল—সে কথা অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই।

সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যই অবশ্য সমালোচকদের কাছে লাঞ্ছিত ও গঞ্জিত হয়ে এসেছে। সামাজিক মনের সাহিত্য-বিদ্বেষের একটা টাট্‌কা উদাহরণ নেওয়া যাক্।—তুমি সম্ভবত জান যে, গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে দু'দল লেখকের আবির্ভাব হয়। একটি ছিল আর্টের দল, আর একটি বিজ্ঞানের দল। Realist-রা বল্‌তেন যে, সাহিত্যের কর্ত্তব্য, সত্য কথা বলা; আর Parnassian-রা বল্‌তেন যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সুন্দর কথা বলা। এ দু-দলের ভিতর অবশ্য যথেষ্ট দলাদলি ছিল, এবং পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে যথেষ্ট মিথ্যা কথা আর যথেষ্ট কদর্য্য কথা বলেছেন। কিন্তু সমালোচকদের হাতে এ দু-দলই সমান মার খেয়েছেন। তাঁরা আর্টের দলকে বল্‌তেন—তোমাদের লেখায় সত্য নেই; আর বিজ্ঞানের দলকে বল্‌তেন—তোমাদের লেখায় সৌন্দর্য্য নেই। সমালোচকেরা অবশ্য সত্যের জন্য কিম্বা সৌন্দর্য্যের জন্য থোড়াই কেয়ার কর্‌তেন—লেখকদের বিরুদ্ধে তাঁদের আসল অভি-যোগ ছিল এই যে, তাঁদের কলমের মুখ দিয়ে যা বার হয় তা কাজের কথা নয়। সত্য জেনেই বা কি হবে, আর রূপ দেখেই বা কি হবে,—সমাজ চায় সেই কথা—যা জীবনের হাটে ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায়, যা পরিবার নামক ছোট ঘরকর্‌না, আর সমাজ নামক বড় ঘরকর্‌না, দুয়েরই সমান কাজে লাগে। মানুষের মনের জীবন তার কাজের জীব-নের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও যে তার অধীন নয়—এ কথা জনসাধারণ মানে না; কেননা কাজ সকলেরই আছে, কিন্তু মন সকলের নেই।

কর্ম্ম ও জ্ঞান, এ দুই বিচ্ছিন্ন না হলেও যে বিভিন্ন, এ কথা ইউ-

রোপেও লুকোনো নেই। সুতরাং সাহিত্যিকরা যখন সমাজকে সম্বোধন করে বল্‌লেন যে,—তোমাদের ঘরকর্‌না তোমরা চালাও, আমরা তার তেল-নুন-লক্‌ড়ি যোগাতে পার্‌ব না; তখন সমাজ উত্তর কর্‌লে যে, আমরা তোমাদের আমাদের বাজার-সরকারি কর্‌তে বল্‌ছি নে, আমাদের হয় হাসাও নয় কাঁদাও। তা'তে বিজ্ঞান ও আর্ট একজোট হয়ে সমস্বরে বল্‌লে আমাদের "বয়ে গেছে।" বিজ্ঞানের দল বল্‌লেন,—আমরা তোমাদের চোখের সুমুখে এমন আলো ধরে দেব, যাতে করে যা সুন্দর তাও কুৎসিত দেখাবে; আর আর্টের দল বল্‌লেন, আমরা রেখা ও বর্ণের এমনি বিন্যাস কর্‌ব যে, তাতে করে যা কুৎসিত তাও সুন্দর দেখাবে। সমাজ প্রতিকূল না হলে, লেখকেরা এতটা গোঁয়ার হয়ে উঠতেন না, এবং Zolaও সরস্বতীর মন্দিরকে ব্যাধি মন্দির করতেন না, এবং Gautierও তাকে চিত্রশালায় ভর্ত্তি কর্‌তেন না। তবে এঁদের একটা কথা খুবই সত্য; সে হচ্ছে এই যে, হাসি-কান্নার বাইরে না গেলে, কি সত্য কি সুন্দর ও দুয়ের কোনটিরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সত্য ও সুন্দরের চর্চ্চাও হচ্ছে একরকমের যোগসাধনা।

যে কথা Leconte-de-Lisle এবং Flaubert-এর মুখে শোভা পায়, সে কথা অবশ্য আমাদের মত লেখকের উচ্চারণ করবারও অধিকার নেই। পাঠকসমাজ যদি আমাদের কাছে হাসি-কান্না চান, তাহলেই আমরা কৃতার্থ হয়ে যাই। ফরমায়েস কর্‌লে আমি অন্তত ওর প্রথম ভাগটা কায়ক্লেশে যোগাতে পারি। কিন্তু পাঠকসমাজ হাসি ভালবাসে না, তারা চায় শুধু কাঁদ্‌তে; অথচ চোখের জলে কলম ডুবিয়ে আমি লিখ্‌লে তাতে হরফ ফোটে না। এইজন্যই ত

এত বাজে বকি, এবং যে ইউক্লিডের আমি কোনও ধার ধারি নে, তারই গুণ গাই। আমার মাল বাজারে না কাটুক, তাতে কোনও ক্ষতি নেই—দুঃখের বিষয় এই যে, দেশে আজকাল সাহিত্য কেউ চায় না। সমাজ চায় সেই পলিটিক্‌স্, যাতে তার ক্রোধ ও মদ বাড়ে,—সেই ইক্‌নমিক্‌স্, যাতে তার লোভ ও মাৎসর্য্য বাড়ে,—সেই দর্শন, যাতে তার মোহ বাড়ায়—আর সেই গল্প ও সেই কবিতা, যাতে তার কামনা বাড়ায়—এবং সে কামনা নিষ্ফল হলে, হা-হুতাশ কর্‌তে শেখায়। বলা বাহুল্য ষড়-রিপুর কোনটিকেই বাড়ানো সাহিত্যের ধর্ম্ম নয়—সাহিত্যের একমাত্র কর্ম্ম হচ্ছে আত্মাকে বাড়ানো। এ কথা যে না বোঝে, তাকে তর্ক-যুক্তির সাহায্যে বোঝান অসম্ভব; কেননা আত্মা-বস্তুকে জানা যায়, কিন্তু বোঝানো যায় না। যা সকলের ভিতর আছে, তা সকল থেকে ছাড়িয়ে কি করে আলাদা করে দেখানো যেতে পারে?—তুমি বলবে এ সব হচ্ছে mysticism-এর বুলি। অবশ্য তাই;—যে লেখার ভিতর mystery নেই, তা কি কখন সাহিত্য হতে পারে?—Mysticism-এর বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই; তবে উপনিষদের "অতিবাদ" শব্দ বোধহয় ঐ জিনিসকেই বোঝায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে যে, যে ব্যক্তি প্রাণতত্ত্ব দর্শন করেন, মনন করেন, এবং আত্ম যে সর্ব্বের অতিরিক্ত এইরূপ নিশ্চয় করেন, তিনিই অতিবাদী হন। এবং এই সূত্রে সনৎকুমার উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি কেউ বলে তুমি অতিবাদী—তাহলে উত্তরে বলবে—হাঁ আমি অতিবাদী; নিজের অতিবাদিত্ব স্বীকার কর্‌বে, কখন গোপন কর্‌বে না। সুতরাং mysticism-কে প্রত্যাখ্যান কর্‌বার আমাদের কোনও দায় নেই। এ সত্য কি সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে যে, যার অন্তরে দর্শন নেই, তা কাব্য

নয়; আর যার অন্তরে অতির ধারণা নেই, তা দর্শন নয়। সে যাই হোক্, পৃথিবীর যে-কোন ভাষার যে-কোন কাব্য নিয়ে তাকে বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করে দেখাও ত, তার কবিত্ব কোন্ উপাদানের মধ্যে নিহিত?—যদি তুমি তা পার, তাহলে তুমি মানুষের দেহকে dissect করেও হাতে ধরে দেখিয়ে দিতে পার তার প্রাণ কোথায়। যার ভিতর রহস্য নেই, তার ভিতর আনন্দও নেই; আর যার ভিতর আনন্দ নেই—তার ভিতর সত্যও নেই, সৌন্দর্য্যও নেই। মানুষে আনন্দের অধিকারী বলেই কাব্য ও কলার সৃষ্টি করেছে।

যারা কথা নিয়ে কারবার করে তারাই জানে, ও হচ্ছে একরকম আগুন নিয়ে খেলা করা। কথার শক্তি অসীম, এবং সে শক্তি যেমন প্রাণ-বর্দ্ধক তেমনি মারাত্মক। কথায় আত্মাকে যেমন জাগিয়ে তোলে, তেমনি আবার তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। মানুষে একটা কথার মত কথা পেলে তাই আঁকড়ে ধরে জীবন যাপন করে,—সে কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাটা তারা আর আবশ্যক মনে করে না। সাহিত্যের উপর সমাজের রাগই এই যে, সাহিত্য নতুন কথা বলে, আর না হয়ত পুরোণো কথার নতুন অর্থ বার করে। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ "আনন্দ" শব্দটি মানুষের মুখে সহজেই একটা বুলি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ দেশে সে ভয় বিশেষ আছে। বড় বড় কথাকে অর্থহীন বুলিতে পরিণত করতে আমরা সিদ্ধহস্ত। অতএব আনন্দ শব্দের মর্ম্ম আমি কি বুঝি, তা তোমাকে বলছি।

আনন্দ অর্থ আমোদ নয়, আরাম নয়, এমন কি সুখও নয়। আনন্দ মনের শান্তি ভঙ্গ করে। সেই কারণে যাঁরা মানুষকে আনন্দের বারতা শুনিয়েছেন, তাঁরাই পৃথিবীতে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করেছেন।

যীশুখৃষ্ট স্পষ্টই বলেছেন যে "আমি তোমাদের শান্তি দিতে আসি নি, দিতে এসেছি অসি"। শ্রীকৃষ্ণ অসি নিয়ে আসেন নি, এসেছিলেন বাঁশি নিয়ে। কিন্তু সে বাঁশি যে কি গোল ঘটিয়েছিল, তা সকলেই জানেন। সে বাঁশির ডাকে যমুনা যে উজান বয়েছিল—সে আনন্দে, সুখে নয়। যার প্রতি অণু পরমাণুকে উজান ঠেলে যেতে হয়, তার সুখই বা কোথায়, আর সোয়াস্তিই বা কোথায়? সাহিত্যের অসিই বল আর বাঁশিই বল—দুয়েরই কাজ হচ্ছে সকল মনের শান্তি ভেঙ্গে দেওয়া। কেননা কাব্য চায় মানুষকে আনন্দ দিতে, আর কবি জানে যে শান্তি হচ্ছে সীমার ধর্ম্ম—আনন্দ অসীমের। এই সীমা অতিক্রম করবার শক্তিপ্রয়োগে আনন্দের জন্ম, এবং সেই শক্তির বৃদ্ধিতেই আনন্দের স্ফূর্ত্তি। মানুষ ঘর ছাড়তে চায় না, আর সাহিত্য তাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে চায়। এই জন্যেই ত সাহিত্যের উপর সমাজের এত আক্রোশ, এত অত্যাচার। অতএব প্রতিদেশে প্রতিযুগে সাহিত্যের কথা সামাজিক sedition হিসাবে গণ্য। সুতরাং আমরা যদি সাহিত্য রচনা না করে বাজে বকি, তাতে আমাদের বুদ্ধির দোষ দিতে পার না।

এ কথা শুনে তুমি হেসে বলবে যে, আমি যখন কবি নই—তার্কিক, তখন আমার ভয় কি?—এ কথা আমি মানি যে, আমি কাউকে আনন্দ দিতে পারি নে বলে অনেককে শিক্ষা দিতে চাই। কিন্তু বিচার করাও যে সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ নয়—বৌদ্ধ শাস্ত্র হতে তার প্রমাণ দিচ্ছি। তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস জান, অতএব তোমাকে বলা বাহুল্য যে King Menander ছিলেন বহ্লিকের গ্রীক ভূপতি, এবং তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ভিক্ষু নাগসেন ছিলেন তাঁর দীক্ষা-গুরু। নাগসেনের সঙ্গে Menander-এর প্রথম সাক্ষাতে কি কথোপকথন

হয়েছিল, "মিলিন্দ পঞহো" থেকে এখানে তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

রাজা বলিলেন, "ভদন্ত নাগসেন, আমার সহিত আপনি আলাপ করিবেন কি ?"

—মহারাজ, আপনি যদি পণ্ডিতগণের বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করেন, আমি আলাপ করিব। আর যদি রাজাগণের বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করেন, মহারাজ তবে আমি আলাপ করিব না।

—ভদন্ত নাগসেন, পণ্ডিতগণ কি প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ?

—মহারাজ, পণ্ডিতগণের বিচারে (বাদী ও প্রতিবাদীর দুরবগাহ প্রশ্নরূপ) আবেষ্টনও করা হয়, এবং (তাহার যথোচিত উত্তররূপ) নিরাবরণও করা হয় ; কোন বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হয়, এবং তদ্বিরুদ্ধ বৈলক্ষণ্যও প্রদর্শিত হয়। তজ্জন্য পণ্ডিতেরা কোপ করেন না। মহারাজ, পণ্ডিতেরা এই প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন।

—আর রাজারা কি প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ?

—মহারাজ, রাজারা আলাপে কোন একটি বস্তুর প্রতিজ্ঞা করিয়া লন। যদি কেহ ঐ বস্তুকে প্রতিকূল ভাবে প্রতিপাদন করে, তবে তাঁহারা ইহাকে দণ্ড দাও বলিয়া তাহার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। মহারাজ, রাজারা এই প্রকারে আলাপ করেন।

এ কথা যে সত্য, তা একালেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য ; আর এ কথা কে না জানে যে, একালে সাহিত্য-সমাজের রাজাগণ হচ্ছেন জনসাধারণ,—ইংরাজিতে যাকে বলে public। সুতরাং স্বয়ং নাগসেন যখন রাজার সঙ্গে বিচার করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন, তখন আমি যে

public-মহারাজার সঙ্গে বিচার করতে কুণ্ঠিত হব, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

নাগসেন অবশ্য অবশেষে মহারাজ মিলিন্দের সঙ্গে বহু বিচার করেন, তার কারণ তাঁর শেষ কথার উত্তরে মহারাজ বলেন :—

"ভদন্ত নাগসেন, আমি পণ্ডিত-বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করিব, রাজবিচার অবলম্বন করিব না। ভদন্ত, আপনি বিশ্বস্ত হইয়া আমার সহিত আলাপ করুন। আপনি যেমন ভিক্ষু সামণের (নব শিষ্য) উপাসক বা পরিচারকের সহিত আলাপ করেন, সেইরূপ বিশ্বস্ত হইয়া আলাপ করুন, আপনি ভয় করিবেন না।"

এ হেন অভয় পাঠকসমাজ আমাকে কখনই দেবেন না ;—কেননা Menander মহারাজা হলেও গ্রীক, আর আমাদের জনসাধারণ আর যাই হ'ন, গ্রীক নন। এ ক্ষেত্রে বাজে বকা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে ?

২০শে জুলাই, ১৯১৮ খৃঃ

বীরবল।

সাহিত্যের জাতরক্ষা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

——:*:——

যিনি বলেন যে বহুদিন হ'ল আমরা সমুদ্র যাত্রা করি নি, আজই বা তা কর্‌তে যাব কেন? আর যিনি বলেন যে অতীতকালে আমাদের কবিরা রাধা-কৃষ্ণের গান লিখেছেন, আজই আমরা মহীন্ বা বিনোদিনীর মনের প্রাণের খোঁজ নেব কেন? এই দু' ব্যক্তির মধ্যে বাস্তবিক পক্ষেই কোন প্রভেদ নেই। এই দু'জনের মধ্যেই রয়েছে একটা দীনতা। এই দীনতাতেই তাঁরা জাতীয়তা তথা 'পেট্‌রিয়টিজ্‌ম'-এর উজ্জ্বল রঙ চড়িয়ে বীরত্ব বলে' চালান করে দিতে চাচ্ছেন।

যাদের নিজের উপরে কোন ভরসাই নেই, তারাই পদে পদে পিছন ফিরে আপনার পথ ঠিক কর্‌তে চায়—আর যাদের বাস্তবিকই কিছু বল্‌বার নেই, তারাই আপনার কথা গুলোকে অতীতের ছাঁচে ঢালাই করে' তার একটা মূল্য বাড়িয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করে। এ যেন "কীটোপি সুমনোসঙ্গাৎ"—দেবতার মাথায় গিয়ে চড়ে' বস্‌বার চেষ্টা। এই হচ্ছে তাদের দীনতা।

কিন্তু একথা ভুলে গেলে চল্‌বে না যে, এমন লোকও থাক্‌তে পারেন, যাঁর বাস্তবিকই নিজস্ব কিছু বল্‌বার আছে। আর তিনি নিশ্চয়ই সে কথা বল্‌বেন—আপনার ভাষায়, আপনার সুরে, আপনারই অন্তরের

রঙ্ ফলিয়ে। তাঁকে আমরা কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব না। আর সেই না পারাটা অতি সুখের কথা।

কিন্তু ঐ যে দীনতা—ওদীনতা কিন্তু মানুষ কোন দিনই স্বীকার কর্‌বে না। অন্তত যেমানুষের বাঁচ্‌বার ক্ষমতা আছে সে—মানুষ। কারণ এই দীনতা যে মানুষ স্বীকার কর্‌বে সেই মানুষই প্রকৃত পক্ষে তার জাতীয়তার মূলে কুড়ুল মার্‌বে। কেননা এটা খুব স্পষ্ট কথা যে, একটা কোন জাতিকে মেরে ফেলে তার জাতীয়তাকে বাঁচিয়ে তোলা যায় না। আর একটা জাতিকে বাস্তবিক মেরে ফেলা হবে, যদি সেই জাতির প্রত্যেক মানুষটা আপনাকে ঐ দীনতার সাবু-বার্লি দিয়ে পুষ্ট কর্‌তে থাকে।

একটা কথা কিন্তু মনে না লেগে যায় না। সেটা হচ্ছে এই যে, যাঁরা আজ বাঙ্‌লা-সাহিত্যে 'জাতীয়তা জাতীয়তা' বলে' খুব কলরব কর্‌ছেন, মনে হয় তাঁরা ভাবছেন যে বাঙালীর জাতীয়তাটা বুঝি তাঁদের কয়েক জনের মুঠোর মধ্যেই আছে। এইটে তাঁদের একটা মহাভুল। এই ভুলটাকে তাঁরা ভুল বলে' মনে কর্‌তে পার্‌ছেন না—নইলে তাঁদের কোলাহলটা অনেকটা নরম হ'য়ে আস্‌ত। আসল কথা এই যে, বাঙালীর জাতীয়তার হিসেবটা আমাদের কারও জামার পকেটে নেই—আছে সেটা এক বিশ্ব-বিধাতার মনের পটে।

কতকগুলো জিনিস আছে যার সংজ্ঞা কেউ দিতে পারে না, যেমন—ব্রহ্ম, কবিত্ব। তেমনি একটা জাতির জাতীয়তা যে কি, তারও সংজ্ঞা কেউ দিতে পারে না, কেননা জীবন জিনিসটা জ্যামিতি নয়, পরিমিতিও নয়। কিন্তু ব্রহ্ম বা কবিত্বের সংজ্ঞা দেওয়া না গেলেও, ব্রহ্ম বা কবিত্ব যে কি নয় তা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে।

তেমনি একটা জাতির জাতীয়তার সংজ্ঞা নিরূপণ করা না গেলেও তার জাতীয়তা যে কি নয় তা বলা তত শক্ত নয়। সেই জন্য একথা আজ আমরা নির্ভয়ে বল্‌তে পারি যে, বাঙালীর জাতীয়তা আর যাই হোক্ সেটা কেবল রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলা বা বৈষ্ণব মহাজনের রসতত্ত্ব নয়। কেন নয়?—এ সম্বন্ধে যা মনে হয় তা বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।

(২)

জগতে যত ধর্ম্ম আছে তার মধ্যে আমরা, হিন্দুরা, কেবল আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সনাতনত্বের দাবী কর্‌তে পারি। কেন পারি তাও বল্‌ছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই একটা উল্টো ধারণা আছে, সেইটে আগে বলে' নেব।

অনেকে মনে করেন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম তার মানে হচ্ছে এই যে, অতীত কালের যা কিছু তাই চিরকালের সত্য। বেদে যে সব উপলব্ধি বা চিন্তার কথা আছে, যে সব ক্রিয়া কাণ্ডের ব্যবস্থা আছে—অর্থাৎ সেই যুগের মানুষেরা যে রকম অবস্থার মধ্যে যে-রকমে আপনার জীবনের সত্যকে, জগতের সত্যকে, ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন, জীবনের, জগতের, ভগবানের ও সত্যের সেই রূপই, কেবল চিরন্তন সত্য। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম তার অর্থ এ নয়। এর মানে যদি তাই হয়, তবে আমরা বাঙালীরা আজ কেউই হিন্দু নই। কারণ আমাদের চিন্তার রাজ্য আর বৈদিক যুগের মানুষের চিন্তার রাজ্যের মধ্যে তিন সাত্তা একুশ সমুদ্র ও তিন তেরং উনচল্লিশ নদীর ব্যবধান, আর আমাদের কর্ম্মের সঙ্গে বৈদিক যুগের কর্ম্মের যে

মিল সেটা শুধু "কৃ" ধাতুর মিল, তবে আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে, যেমন বিবাহ পৈতে শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে এখনও সে যুগের ক্রিয়াদির একটু ছিঁটে ফোঁটা রকমের মিল আছে। তবে বলা বাহুল্য সবাই জানেন যে, সে মিলটা অত্যন্তই বাহিরের মিল—ভিতরের নয়। কেবল তাই নয়। আমাদের ধর্ম্মের সনাতনত্বের ঐ অর্থ অনুসারে আমাদের আর হিন্দু হবার কোন দিনই উপায় নেই। কারণ, যতই চেষ্টা করা যাক্ না কেন, একই কল্পযুগে বিশ্বমানবের জীবনে একই ভাব ঠিক অবিকল একই রকমে দু'বার আসে না—বিশ্বমানবের যে কোন অংশ সম্বন্ধেও সেই কথা।

কিন্তু ঐ যে বলেছি "কৃ" ধাতুর মিল—ঐ মিলটাই হচ্ছে আসল মিল। ঐটেই হচ্ছে সনাতনত্বের মূল—ঐ দিক থেকেই হিন্দু সনাতন। ঐ "কৃ" ধাতুর পিছনে হাজার যুগে হাজার প্রত্যয় লাগিয়ে হাজার ভঙ্গীতে মানুষ নাচ্‌বে কিন্তু "কৃ" সর্ব্বদাই "কৃ"। এই সত্যটাই প্রাচীন ঋষিরা দেখতে পেয়েছিলেন, আর অর্ব্বাচীন আমরা, দেখতে পাচ্ছি নে। সে যুগের তাঁরা বুঝেছিলেন যে, প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তন করা চল্‌তে পারে কিন্তু ঐ "কৃ" ধাতুকে ত্যাগ করবেন যিনি, তাঁর এ জগতে নিষ্কৃতি নেই। আর আজ আমাদের যে অবস্থা তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, ঐ "কৃ" ধাতুটাকে খাটো করে' আমরা প্রত্যয়টাকে বাড়িয়ে তুলে মনে করেছি যে সেইটেই সনাতন।

তেমনি আমাদের ধর্ম্মের সঙ্গে চার হাজার বছর পূর্ব্বের আর্য্যদের ধর্ম্মের যে মিল সেটা হচ্ছে "কৃ" ধাতুর মিল—মনের মিল নয় কিম্বা অনুষ্ঠানের মিল নয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই পুরাতন মনকেই সনাতন বলে' মনে করেন। কথাটা আমি বানিয়ে বল্‌ছি নে।

এর প্রমাণ এই যে, আজও প্রাচীন কালের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নাম করে' মাঝে মাঝে হা হুতাশ শুন্‌তে পাওয়া যায় এবং তা প্রবর্ত্তন করবার ধুয়োও মধ্যে মধ্যে ওঠে। এঁরা গায়ের জোরেই মনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে চান। কিন্তু মনের জোর যে গায়ের জোরের চাইতে জেয়াদাই হ'য়ে থাকে, এটা সনাতন সত্য। প্রাচীন কালের মানুষেরা নিজ নিজ মন নিয়েই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে' গেছেন আর আমরাই বা কেন আমাদের নিজের মন নিয়ে আমাদের নিজের জীবন গঠন কর্‌ব না—এ প্রশ্নটা যে কেন অনেকের মনে উদয় হয় না, সেটা আশ্চর্য্যই বল্‌তে হবে—বিশেষত এই Self-determination-এর দিনে। Self-determination যে কেবল রাজনৈতিক জগতেই সুখ স্বাস্থ্য ও আনন্দের মূল তাই নয়—মানুষের অন্তরের জগতেও তাই। তবে এই রকমের মনের ভাবের কারণও যে নেই তা নয়। আমি আগেই বলেছি—সেটা হচ্ছে মানুষের দীনতা, তার নিজের উপর ভরসার অভাব। সেকালের সবাই ছিলেন এক একজন প্রকাণ্ড ঋষি আর একালের আমরা সবাই এক একজন দীন অকিঞ্চন! মানুষের এই ভাব মানুষকে কোন দিনই অমৃতের পথে নিয়ে যাবে না। এই ভাব মানুষের শক্তিকে কোন দিনই উদ্বুদ্ধ কর্‌বার সাহায্য কর্‌বে না। আর যে শক্তিহীন তার যে আত্মদর্শন লাভ ঘটে না—এ ত উপনিষদেরই কথা।

প্রাচীন কালের ঋষিরা মনকে সত্য বলে' জেনেছিলেন, কারণ তাঁরা মানুষের প্রকৃতি বলে' যে জিনিসটা আছে, তার রহস্য বুঝেছিলেন। প্রকৃতির ধর্ম্ম যে কি, তা বুঝেছিলেন, তাই তাঁরা মানুষের ধর্ম্মকে কোন "ক্রীড"-এর দ্বারা আবদ্ধ করেন নি—মানুষের ধর্ম্মকে

তাঁরা "রিলিজন" করে" তোলেন নি। 'রিলিজন' হচ্ছে ভগবানে পৌঁছবার পাকা সড়ক, আর ধর্ম্ম হচ্ছে আত্ম-সাক্ষাৎ লাভ কর্‌বার প্রকৃতির মেঠো রাস্তা। আর আত্ম-সাক্ষাৎ লাভ হলেই ভগবান দর্শন হয়। কেননা ভগবান যে মানুষকে তাঁর নিজের 'মডেলে' তৈরী করেছেন, সে-কথা বাইবেলেও বলে।

কিন্তু 'রিলিজন' ভগবানে পৌঁছিবার পাকা সড়ক হলেও যে সেটা সোজা রাস্তা এমন নয়—কেননা মনটা 'রিলিজনের' "ক্রীডে"র জালে জড়িয়ে পড়ে। ও অবস্থায় ভগবান ত দূরের কথা—মানুষ নিজেকেই দেখ্‌তে পায় না। মনের যা সত্য তা মনের মধ্যেই আছে—তা তার বাইরে নেই। বাইরের "ক্রীড" হয়ত মনের কাছে ঘোর মিথ্যা। আর মিথ্যার মধ্যে মানুষের দৃষ্টি খোলে না কোনদিন, বরং আরও ঘুলিয়ে যায়। আর ঘুলিয়ে-যাওয়া দৃষ্টি নিয়ে নিজেকেও বোঝা যায় না—ভগবানকেও পাওয়া যায় না।

এই যে এক যুগের মানুষের মন আর এক যুগের মানুষের মনের সঙ্গে এক নয়, আবার এক যুগের মানুষের মধ্যেই একজনের প্রকৃতি আর একজনের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন—এই সত্যটা প্রাচীন ঋষিরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছিলেন বলে' তাঁদের মধ্যে ধর্ম্ম বলে' যে জিনিসটা গড়ে উঠ্‌ল, সেটা কোন একজনের উপলব্ধ একটা সত্য নয়। আর সেই জন্যেই ক্রিশ্চিয়ান 'ক্যাথলিক' বা 'প্রটেষ্টান্ট' ধর্ম্মে মেরী, খৃষ্ট বা বাইবেলের যে স্থান, মুসলমান ধর্ম্মে মহম্মদ বা কোরাণের যে স্থান, হিন্দুর ধর্ম্মে মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বামন এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও ঠিক সেই স্থান নয়—বেদ বা কোন উপনিষদের বা গীতার ঠিক সেই স্থান নয়। সেইজন্যে হিন্দুর ধর্ম্মজগতে চিন্তার এত বিচিত্রতা—

সংস্কারকের এত সংখ্যা। এক দর্শনেরই ছ' ছ'টা শাখা—উপনিষদ, পুরাণ, উপপুরাণ হাতের পায়ের আঙুল গুণেও সংখ্যা করা যায় না। হিন্দুর ধর্ম্মে সকল প্রকার বিচিত্রতার স্থান আছে বলেই তা সনাতন। তার ধর্ম্মে মানুষের সকল প্রকার সত্যের জন্যেই সিংহাসন পাতা আছে—তাই তা সনাতন। তাই এ ধর্ম্মে প্রকৃতি অনুসারে কেউ ভগবানকে প্রেমময় রূপে পাচ্ছেন, কেউ বা শক্তিময় রূপে দেখ্‌ছেন—কারও আরাধ্য কৃষ্ণ, কারও আরাধ্য কালী। কারও জীবনে চরম সত্য বিকশিত হয়ে উঠ্‌ল—নিরাকার আনন্দময় ব্রহ্মে, আবার কেউ দেখতে পেলেন সাকার ভগবান। এমন কি চার্ব্বাকও হিন্দু, কারণ চার্ব্বাকও মানুষের মনের একটা দিক, একটা অবস্থার প্রতিনিধি। তার স্থানও সনাতনের মধ্যেই—তার বাইরে নয়, অর্থাৎ এক কথায় সনাতন—সনাতন, কারণ তা সমস্তকেই আলিঙ্গন করে' আছে। আর ব্রহ্ম যে চরম সত্য তার কারণ হচ্ছে, ব্রহ্মে সকল সত্যের আরোপ করেও তাঁকে আনন্দময় রূপেই পাওয়া যায়।

এখন উপরের ঐ কথা যদি মানি তবে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, হিন্দুর ধর্ম্ম যদি এম্‌নি ব্যাপক, তার আধ্যাত্মিক জীবনের দিকটা যদি এম্‌নি উদার, তবে সে হিন্দুর সামাজিক জীবন এমন সংকীর্ণ কেন? তবে সে হিন্দু এমন শুচিবাতিকগ্রস্ত কেন? সে শতাব্দী শতাব্দী ধরে' যারাই হিন্দু নয় তাঁদেরই 'পর নাসিকা কুঞ্চিত করে' ম্লেচ্ছ যবন ইত্যাদি নামে আপ্যায়িত করে' আস্‌ছে কেন? তারা অহিন্দু কাউকেই ছোঁয় না—কারও সঙ্গে খায় না এবং ছুঁলে খেলে তাদের ধর্ম্মের পতন হয়—একথা মনে করে কেন? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, হিন্দুর জীবনে ওটা অনেকটা আধুনিক কালের বস্তু—ওটা

তার শক্তিহীন অবস্থার কথা। হয়ত এর মধ্যে কিছু রাজনৈতিক রহস্যও লুকিয়ে আছে। দেশের কথা যে কেবল একালেই অনেকের কাছে দ্বেষের কথা তা নয়, সকল কালেই সেটা কারো কারো কাছে কিছু কিছু তাই ছিল। যার সঙ্গে গায়ের জোরে পারিনে তাকে অস্পৃশ্য মনে করাই প্রশস্ত—এটা সকল বুদ্ধিমানেই বল্‌বেন। ওটা হচ্ছে হিন্দু সমাজের আচারের কথা—হয়ত তার আত্মরক্ষা কর্‌বার প্রয়াসের চিহ্ন। তবে আমাদের এম্‌নি কপাল যে, এখন এই সামাজিক আচার ব্যবহারগুলোই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের ধর্ম্মের আসল রহস্য। সামাজিক অনেক আচার বিচার যে আমাদের মনের কাছে ঘোর মিথ্যা হয়েও টিঁকে আছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা অন্তত শতকরা আশী জনা মনে করি যে, ঐ আচারগুলোই হচ্ছে বৈতরণী পার হবার আসল "লছমন ঝোলা"। তাই যখন আমাদের মধ্যে সৌখীন কেউ একখানা 'মাটন্ চপে'র পাশে পাশেই দুটো দ্বিজ-বিশেষের "হাফ্ বয়েল্‌ড্" অণ্ড নিয়ে জলযোগ কর্‌তে বসেন তখন চারিদিক থেকে অনুষ্টুপ ছন্দে সমস্বরে ঐক্যতান সঙ্গীত আরম্ভ হয়ে যায়—গেল "ধর্ম্ম" গেল "জাত"! এখানে একথা আমার বলা মোটেই উদ্দেশ্য নয় যে, হিন্দু সমাজে বা অপর কোন সমাজে আচার বিচারে একটা পূর্ণ 'এনার্কিজ্‌ম্' রাজত্ব করুক, তাহলে মানুষের মধ্যে সমাজ যে জন্যে গড়ে উঠ্‌ল তা ব্যর্থই হবে; কারণ সমাজের পিছনেও একটা সত্য রয়েছে। এখানে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, হিন্দুর যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল—মানুষের জীবনের জটিল রহস্যের সন্ধান, মানুষের নিজের চোখের সাম্‌নে নিজেকে তুলে ধরা, নিজের সঙ্গে সৃষ্টির, জীবের সঙ্গে জগতের, জগতের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ ইত্যাদি

আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, মানুষের জীবনে যে একটা চিরন্তনের আনন্দ-রস ধারা অনাদিকাল থেকে প্রবহমান, তার আবিষ্কার ও উপলব্ধি—সেই ধর্ম্মের আজ কার্য্য হয়েছে হিন্দুর রন্ধনশালার বিরুদ্ধে অভিযান! এ যেন কামধেনুকে দিয়ে ধান মাড়িয়ে নেওয়া—কামধেনুর অমৃত দেবার ক্ষমতার খোঁজই নেই। যদি বল যে জনসাধারণের কাছ থেকে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দিকটার গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করবার আশা করা পাগলামী।—তার উত্তর হচ্ছে এই যে, কেবল জনসাধারণ নয়, আমাদের সমাজে হোম্‌রা চোম্‌রা যাঁরা, তাঁদের ধর্ম্মও হচ্ছে কোন্ দিন বেগুণ খেতে নেই ইত্যাদি। কিন্তু যাক্ সে কথা।

এখন সনাতত্বের যে ব্যাখ্যা করা গেল, তাই যদি স্বীকার করি তবে কোন্ সাহসে আজ আমরা বল্‌ব যে, বৈষ্ণবের রসতত্ত্বই সকল বাঙালী হিন্দুর অন্তরে সকল কালে সরস হ'য়ে ও সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে বা থাক্‌বে? এই ব্যাখ্যা অনুসারে এই সিদ্ধান্তটাই আপনি গড়িয়ে আসে যে, মানুষের বৈষ্ণবীভাব একটা ভাব, সনাতন ধর্ম্মে বৈষ্ণব "রিলিজন"-এর স্থান একটা স্থান, কিন্তু সব স্থানই তার নয়। এই বৈষ্ণব "রিলিজন"-কে যদি বাঙালীর ধর্ম্মের একান্তরূপ বলে' বাংলাদেশের উপরে চাপিয়ে দি, তবে বাঙালী হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের আসল যে রহস্যটুকু তারই মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। এখন এই বৈষ্ণবীভাব যদি প্রত্যেক বাঙালীর কাঁধে বাহির থেকে চাপিয়ে দি, তবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত নিজের কাছে নিজে মিথ্যা হ'য়ে উঠ্‌বেন, সেই মিথ্যার মধ্যে দুর্ব্বল যাঁরা, তাঁরা কোন দিন আপনার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাবেন না—আর শক্তিমান যাঁরা, তাঁরা বাহিরের ঐ মিথ্যার জাল ছিঁড়ে ফেলে আপনার নিজের অন্তরের সত্যকে আনন্দ-বীণা বাজিয়ে জগতের

মেলায় অভিনন্দিত করবে। হিন্দুর ধর্ম্ম—মানুষের ধর্ম্ম। মানুষের ধর্ম্মে ভগবান নিজেকে এক স্থানেই একান্ত করে' বেঁধে রাখেন নি। দিকে দিকে তাঁর আনন্দ-বীণা সহস্র সুরে, সহস্র রাগিনীতে বাজ্‌ছে—দিকে দিকে তাঁর আনন্দ-স্বরূপ, সহস্র রূপে সহস্র নামে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। এই সহস্র সুর সহস্র রূপ থেকে হিন্দু মানুষকে খণ্ডিত করতে চায় নি—কোন দিন বাঙালী হিন্দুও তা থেকে বঞ্চিত হ'তে চাইবে না—এই আমাদের আশা ও বিশ্বাস। আর এই কারণেই হিন্দুর ধর্ম্ম সনতান ধর্ম্ম।

হিন্দু ধর্ম্মের এই উদারতা, বাঙালী হিন্দুকে মান্‌তে হবে। কিন্তু যদি সে নাও মানে তবে, এই উদারতাই তার জীবনে চিরকাল কার্য্যকরী হ'য়ে থাক্‌বে—কারণ মানুষের জীবনে এই উদারতাই চিরকালের সত্য। আর মানুষ মানুক বা না মানুক, সত্য সব সময়েই তার অজ্ঞাতসারেও আপনাকে জয়যুক্ত করে' তোলে। মানুষ যতই মনে করুক না যে, সে এককালে স্থানুর মতো অচল অটল হয়ে থাক্‌বে, তা সে পারবে না—অনিচ্ছাসত্ত্বে হয় সে এগিয়ে যাবে, নয় অজ্ঞাতসারে সে পিছিয়ে পড়্‌বে, কারণ জীবন বলে' যে জিনিস সেটা জড় নয়, আর সৃষ্টির মধ্যে যার নামনে গতি নেই তারই অগতি, আর অগতি মানেই দুর্গতি।

সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দিকটায় যদি বৈষ্ণব রসতত্ত্বই একমাত্র সত্য না হয়—তবে বাঙালী হিন্দুর জাতীয়তাও তা নয়। কারণ একটা জাতির আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয়তা একই জিনিস—শুধু একটা হচ্ছে ভিতরের স্বরূপ, আর একটা হচ্ছে বাহিরের রূপ।

এখন পূর্ব্বপক্ষ এর উত্তরে একটা কথা বল্‌তে পারেন। তাঁরা

বল্‌তে পারেন—"হে তর্কবাগীশ লেখক! তোমার তর্ক সব বাজে। কিম্বা যদি বাজে নাও হয় তাহলে আমাদের ক্ষতি নেই। কারণ তুমি ধর্ম্মের যে উদারতাই দেখাও না কেন—আমাদের যে কথা, সে হচ্ছে দিব্যদৃষ্টির কথা। আমরা দিব্যদৃষ্টিতে আজ বাঙালীর প্রকৃতিকে স্পষ্ট দেখেছি। আর দেখেছি সে প্রকৃতির গলায় তুলসীর মালা, নাকের ডগায় কনকোজ্জ্বল তিলক, হাতে একতারা, গায়ে নামাবলী, কণ্ঠে পদাবলী। বাঙালীর প্রকৃতি বৈষ্ণবী। আর সেই জন্যেই আজ আমরা বাঙালীকে আর সব মিথ্যা পথ ত্যাগ করিয়ে সেই পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ছি। এই পথই বাঙালার সত্য—সুতরাং এই পথেই তার জীবনের সিদ্ধি ও সার্থকতা।"

এর উত্তরে আমরা শুধু এইটুকু বল্‌ব যে,—তাঁরা ভুল দেখেছেন। আর তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, যেদিন কীর্ত্তনের ভাবতরঙ্গে "শান্তিপুর ডুবুডুবু আর ন'দে ভেসে যায়" যায় হয়েছিল সেদিনও সমস্ত বাংলা বৈষ্ণব হ'য়ে যায় নি।

(৩)

আজ আমাদের সবারই মনের কোণে গোপন একটা আশা—একটা স্বপ্ন আপনাকে স্পষ্ট করে' তুল্‌ছে। আমরা সবাই আজ অনুভব কর্‌ছি, বাঙালী একদিন এ জগতের দশজনের মধ্যে একজন হ'য়ে মাথা উঁচু করে' মানুষের মতো দাঁড়াবে। আর তা কর্‌তে হ'লে প্রথম কর্ত্তব্য—এই জগতে শত সহস্র দ্বন্দ্ব কোলাহলের মধ্যে আপনাকে বাঁচিয়ে চলা। আর সেজন্যে ভগবানকে শুধু প্রেমময় বলে'

জান্‌লেই হবে না—তাঁকে শক্তিময় বলেও মান্‌তে হবে। আমাদের আত্মাকে আজ রসতত্ত্বের মিষ্টি হাঁড়িতেই ডুবিয়ে রাখ্‌লে চল্‌বে না—শক্তির রাজমুকুটেও তাকে মণ্ডিত কর্‌তে হবে।

তাই আজ আমরা আশা কর্‌ব—ঐ মনের কোণে গোপন আশা স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশা কর্‌ব— তরুণ বাংলার অন্তরে অন্তরে নেমে আসুক প্রাণের স্রোতের "পাগ্‌লা ঝোরা।" নেমে আসুক আজ সে "পাগ্‌লা ঝোরা"—উর্ব্বরতাহীন অর্থহীন শত সহস্র সংস্কারের শক্ত মাটী কেটে কেটে—মনের জমাট বাঁধা পাষাণ ভার টলিয়ে দিয়ে দিয়ে—পুরাতনকে আপনার কাছ থেকে আপনাকে মুক্তি দিয়ে দিয়ে—নতুনকে আপনার কাছে আপনাকে সত্য করে' সার্থক করে' তুলে তুলে। নেমে আসুক "পাগ্‌লা ঝোরা,"—এই তরুণ বাংলার উপরে শত ধারায় সহস্র ধারায়—শিল্পে, কথায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, যশে গৌরবে—সহস্র দিক মুক্তির গান গেয়ে গেয়ে—তৃপ্তির গান গেয়ে গেয়ে। আত্মার মুক্তি হোক্—আত্মার তৃপ্তি হোক্। আজ যে তরুণ বাংলার হৃদয়ে আকুল স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে—মুক্তি, মুক্তি। সে মুক্তি কেবল বাহিরের নয়—ভিতরের;—কেবল দেহের নয়—অন্তরের। সে যে আজ—

প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে যায়
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়
আলিঙ্গন তরে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়।
প্রভাত কিরণে পাগল হইয়া
জগত মাঝারে লুটিতে চায়।

আজ সে যে এ জগতের মুখ নতুন করে' দেখেছে। তাই আজ তার প্রাণে প্রাণে নতুন সুর বেজে উঠেছে—

দেখিব না আজ নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে।
আমি—ঢালিব করুণা ধারা,
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

সে আজ নিজের পথ নিজে কেটে কেটে চল্‌বে। সে পথ যদি অতীতের সঙ্গে মেলে তবে মিলুক—কিন্তু অতীতের অনুকরণ সে করবে না—তাতে পদে পদে পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রোম।

(প্রথম প্রস্তাব)

(১)

জোর করে' লেগে থাক্‌লে দেখ্‌ছি অসাধ্যও সাধন করা যায়। এভ্‌রিম্যানের অনুবাদে চার ভালুম মম্‌সেনের রোমের ইতিহাস শেষ হয়ে গেল। অবশ্য এপুঁথির শেষে পৌঁছে দেখি গোড়ার দিক্‌কার অনেক কথা, মনের মধ্যে ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। কেল্টজাতির স্বাধীনতা রক্ষার নিষ্ফল চেষ্টার করুণ কাহিনী, স্যাম্‌নাইটদের রোমের নাগপাশ থেকে মুক্তির বৃথা প্রয়াসের ইতিহাসকে একরকম ঢেকে ফেলেছে। সিজারের জয়ধ্বনিতে, হ্যানিবালের স্তুতিগানও প্রায় ডুবে গেছে। সন তারিখের ত কথাই নাই। প্রথম থেকেই তার গোলযোগ সুরু হয়েছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত সব একাকার হয়ে গোলযোগের সম্ভাবনারও লোপ ঘটেছে। মোট কথা, রোমের ইতিহাসে পরীক্ষা দিতে বস্‌লে যে, সে পরীক্ষাতে ফেল হব এটা নিশ্চয়। তবুও ল্যাটিন জাতির বিজয় যাত্রার এই অধ্যায়গুলি, মম্‌সেনের বর্ণনায় মনের মধ্যে যে দাগ কেটে গেছে, তা সহসা মুছে যাবে না। ভূ-মধ্যসাগরের চার পাশের যে ভূ-খণ্ডকে আধুনিক যুগের রোমের ঐতিহাসিকেরাও পৃথিবী বলেই উল্লেখ করেন, তার বহু রাজ্য ও বিচিত্র জাতিগুলির উপর রোমের এক-রাট্‌ ও একছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মনকে যে দোলা দিয়েছে, তার বেগ শেষ হতে কিছু সময় লাগ্‌বে।

পাঠকেরা শঙ্কিত হবেন না। মম্‌সেন থেকে দুটো অধ্যায় ইংরেজি অনুবাদের বাঙ্গলা তর্জ্জমা করে' দিয়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকপদ লাভের কোনও চেষ্টাই ক'র্‌ব না। রোম সম্বন্ধে এখানে যা কিছু বল্‌তে যাচ্ছি তা নিতান্তই এলোমেলো রকমের। তাতে প্রত্ন-তত্ত্বের পাণ্ডিত্য এবং ইতিহাসের গাম্ভীর্য্য—এ দুয়ের অত্যন্ত অভাব। সুতরাং যাঁরা প্রবন্ধের নাম দেখে পড়্‌তে সুরু করেছেন তাঁরা হয়ত আর অগ্রসর না হ'লেই ভাল কর্‌বেন। আর যাঁরা নাম দেখেই পাতা উল্টে যেতে চাচ্ছেন, তাঁরা একবার শেষ পর্য্যন্ত পড়বার চেষ্টা কর্‌লেও কর্‌তে পারেন।

(২)

প্রাচীন হিন্দুজাতি এবং তাদের সভ্যতা আমাদের পশ্চিমের মাষ্টার ম'শায়দের কাছে অনেক রকম গঞ্জনা শুনেছে। তিরস্কারের একটা প্রধান বিষয় এই যে বংশপরিচয়ে তাঁরাও ছিলেন রোমানদেরই জ্ঞাতি। সুতরাং সেই একই রক্ত শরীরে থাক্‌তে তাঁরা যে কেমন করে হিন্দু-সভ্যতার মত এমন দুর্ব্বল ও বিকৃত সভ্যতা গড়ে বস্‌লেন, এটা পণ্ডিতদের মনে যেমন বিরাগেরও সঞ্চার করেছে তেম্‌নি জিজ্ঞাসারও জন্ম দিয়েছে। এবং এই সংশয়ের সমাধানে তাঁরা নানা রকম সম্ভব অসম্ভব, অবশ্য সকলগুলিই 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদের প্রচার করেছেন। গল্প আছে, ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস্‌ রয়েল সোসাইটীর নতুন প্রতিষ্ঠা করে' পণ্ডিতদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, মাছ মর্‌লেই ঠিক সেই সময়টা তার ওজন বেড়ে যায় কেন? পণ্ডিতেরা উত্তর খুঁজে

গলদঘর্ম্ম হয়ে গেলেন। অবশেষে একজন বল্লেন, আচ্ছা দেখাই যাক্‌ না ওজন ক'রে, মাছটা মরলেই তা যথার্থ বেশী ভারী হয়ে ওঠে কিনা। মম্‌সেনের বিপুলায়তন পুঁথি শেষ করে' এই কথাটাই বারবার মনে হয়েছে, যে যাঁরা এই রোমান-সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতাকে অতি খাটো ও নিতান্ত হাল্কা বলেছেন, 'সভ্যতা' বল্‌তে তাঁরা কি বোঝেন? সভ্যতার কোন্‌ মাপকাটিতে তাঁরা এই দুই সভ্যতাকে মাপ করেছেন? কোন্‌ তৌলে এদের ওজনে তুলেছেন? এই যে রোমান-সভ্যতা, যার গৌরবের দীপ্তিতে পণ্ডিতদের চোক ঝল্‌সে গেছে, এ ত একটা একটানা পরের দেশ জয় ও অন্য জাতির উপর আধিপত্য স্থাপনের ইতিহাস। প্রথম 'লেশিয়ামের' উপর রোমের প্রভুত্ব বিস্তার, তারপর তারি সাহায্যে উত্তরের ইট্রাস্‌কানদের ধ্বংশ করে' ইতালীর আর সকল জাতিগুলোকে পিষে ফেলে গোটা দেশটায় নিজের আধিপত্য স্থাপন। আবার মেডিটারেনিয়ানের ওপারের প্রবল রাজ্যটী, সিসিলির সেতু পার হয়ে এই আধিপত্যের কোনও বিঘ্ন ঘটায়, এই আশঙ্কা-তেই কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বিজিত ইতালীর সাহায্যে তাকে সমূলে উচ্ছেদ; এবং কাথেজের অধিনায়ক 'হ্যামিলকার বার্‌কা' বা বিদ্যুতের বংশধর, স্পেন থেকেই যাত্রা সুরু করে' বজ্র হয়ে রোমের মাথায় ভেঙ্গে পড়েছিল বলে, শত্রুর শেষ রাখতে নাই এই নীতি অনুসারে স্পেনেও রাজ্য বিস্তার। এম্‌নি ক'রে দক্ষিণ আর পশ্চিমের ভাবনা যখন ঘুচ্‌ল তখন স্বভাবতই দৃষ্টি গেল পূবের দিকে। গায়ে জোর থাক্‌লে এ 'আশঙ্কার' ত আর শেষ নাই! পূবে তখন ছিল আলেক্‌জেণ্ডারের ভাঙ্গা সাম্রাজ্যের গোটা কয়েক বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা। ওরি মধ্যে যে দুটি একটু প্রবল—ম্যাসিডন আর এসিয়া, তারা তখন রোমেরই মত

আশপাশের রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে' নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় ছিল। এ ব্যাপারকে অবশ্য উপেক্ষা কি মার্জ্জনা কিছুই করা চলে না। কেননা পরের দেশ জয় করে' রাজ্য ও বলবৃদ্ধি জিনিসটি মানুষের ইতিহাসের আদিযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতিরই নিজের পক্ষে খুব সুসঙ্গত ও অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্য সকলের বেলাই নিতান্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে মনে হয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়েই রোমকে এ দুটি রাজ্য আক্রমণ করতে হ'ল ; এবং এদের বাহুল্য অংশগুলি ছেঁটে ফেলে যাতে এরা অতঃপর বেশি নড়াচড়া না করে' ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হ'ল। এমন কি সঙ্গে সঙ্গে রোম একটা মহানুভবতার পরিচয় দিতেও কসুর করলে না। ইতালীতে তখন হেলেনিক সভ্যতার স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে। তারি গুরুদক্ষিণা হিসাবে গ্রীসের ছোট ছোট নখদন্তহীন নাগরিক রাজ্যগুলিকে ম্যাসিডনের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত করে' রোম তাদের একবারে স্বাধীনতা দিয়ে দিল। কিন্তু দুঃখের কথা মহানুভবতার এ খেলাও রোম বেশি দিন খেলতে পারল না। কারণ দানে পাওয়া স্বাধীনতার মানেই হ'ল—স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগটা করতে হবে দাতারই ইচ্ছা অনুসারে। সুতরাং গ্রীসের চপল প্রকৃতির লোকগুলি যখন নিয়মের ব্যতিক্রম করে', ম্যাসিডনের আবার মাথা তুলবার চেষ্টা দেখে, তাকেই নায়ক ভেবে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ করল, তখন এই পূর্ব্বের দেশগুলির আধা স্বাধানতা আধা অধীনতার বিশ্রী অবস্থাটা ঘুচিয়ে সোজা-সুজি এদের করায়ত্ত করে' নেওয়া ছাড়া রোমের আর গত্যন্তর থাকল না। এর পর রোমান চোখের দিক্‌চক্রবালে যে দুটি রাজ্য বাকী থাকল, সিরিয়া আর মিশর, তাদের নিয়ে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হ'ল

না। অবস্থা দেখে তারা আপনারাই এসে রোমের পায়ে মাথা টেকালে। সাম্রাজ্য যখন গড়ে উঠল তখন কাজে কাজেই তার "বৈজ্ঞানিক চৌহদ্দি"-রও খোঁজ পড়ল। কৃষ্ণসাগরতীরের মিথ্‌রেডেসিরের রোমের শিকল ভেঙ্গে হাত পা ছড়াবার দুরাকাঙ্ক্ষা দমন উপলক্ষে, রাজ্যের পূব-সীমা ইউফ্রেটিসে গিয়ে ঠেকল, এবং স্বয়ং জুলিয়স কেণ্টদের মৃতদেহের উপর দিয়ে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্রাটেরও আবির্ভাব হতে খুব বেশি বিলম্ব ঘটল না। কেননা তিন শ বছর রাজ্য-জয়ে আর রাজ্যভোগে প্রাচীন রোমান বল-বীর্য্য-ঐক্য সকলেরই তখন লোপ হয়েছে। প্রকৃতির পরিশোধ! আর পররাজ্যজয়ে যে সাম্রাজ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধজয়ী সেনাপতি তার নায়কত্ব না পেলেই বরং বিস্ময়ের কারণ হ'ত। সিজারের উত্তরাধিকারীরা আরও তিন শ বছর ধরে' এই রোম-সাম্রাজ্য, যাকে কোন রকমেই আর রোমান সাম্রাজ্য বলা চলে না, শাসন ও রক্ষা করলেন। রাজ্যের সকল জাতির লোকের মধ্যে রোম-নাগরিকের অধিকার ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল, কেননা তখন সকলেই রোম-সম্রাটের সমান প্রজা, 'ফেলো সিটি-জেনের' অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ফেলো সাব্‌জেক্ট'। উঁচু আশা ও বড় আকাঙ্ক্ষার তাড়না না থাকলে যে শান্তি আপনিই আসে, রাজ্যজুড়ে সে শান্তি বিরাজ করতে লাগল। ঘরকন্নার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী পাকা আইন কানুন এই বহুজাতি ভূয়িষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে গড়ে উঠল। তারপর মানুষের গড়া অপর সকল রাজ্যের মত রোম-সাম্রাজ্যও ভেঙ্গে পড়ল। ইউরোপের সভ্যতার কেন্দ্র ভূ-মধ্যসাগর ছেড়ে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরকে আশ্রয় করল। তারি তীরে তীরে

নবীন নানা জাতির মধ্যে মানুষের সভ্যতার চির-পুরাতন ও চির-নূতন খেলার আরম্ভ হ'ল।

(৩)

এই যে ছয় সাত শ বছরের রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসনের পলিটিকাল ইতিহাস, রোমান সভ্যতা ও গৌরবের কাহিনীরও এই হ'ল অন্তত চোদ্দ আনা। একে বাদ দিলে রোমান সভ্যতার যা অবশিষ্ট থাকে তার গৌরবের কাছে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কথা দূরে থাক্, তার চেয়ে অনেক ছোট সভ্যতারও মাথা নীচু করার কোনও কারণ দেখা যায় না। হেলেনিক সভ্যতার দৃষ্টান্তটি চোখের সাম্‌নে থাকলেও নিজেদের সভ্যতার এই স্বরূপ সম্বন্ধে রোমানদের মনেও সংশয়ের কোনও অবসর ছিল না। আগষ্টাশের সভাকবি তাঁর যুগের আত্মবিস্মৃত রোমানদের প্রকৃত রোমান-গৌরব স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বল্‌ছেন,—'জানি আর আর সব জাতি আছে যারা কঠিন ধাতুকে সুষমাময় গড়ন দিতে পারে, পাথরের হিম দেহ থেকে প্রাণের বিপুল উচ্ছ্বাস খুজে বের করতে পারে, জ্ঞানের আঙুল আকাশে তুলে নক্ষত্রলোকেরও সকল বার্ত্তা এঁকে দেখাতে পারে, কথার সঙ্গে কথা গেঁথে লোকের করতালি নিতেও তারা পটু, কিন্তু রোমান, এ সব কাজ তোমার নয়। তোমার কাজ হ'ল—সকল জাতির উপর রাজত্ব করা। সেই হ'ল তোমার শিল্পকলা। তোমার গৌরব হ'ল বিজিত রাজ্যে শান্তি আনা, উঁচুমাথাকে যুদ্ধে নীচু করা, পতিত যে শত্রু তাকে করুণা দেখান। 'এনিড' যে ইতিহাস নয় কাব্য, পতিত শত্রুকে করুণা দেখানোর কথা বলে' ভার্জিল বোধ হয় তারি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা রোমের ইতিহাসের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এ

বস্তুটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যা হোক, ল্যাতিন কবির রোমান সভ্যতা ও গৌরবের এই বর্ণনাটী আধুনিক কালের রোমান-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এক রকম সকলেই মেনে নিয়েছেন। কারণ না মেনে উপায় নাই। এবং এরি মধ্যে মানুষের সভ্যতা, প্রকৃতি ও শক্তির বিরাট বিকাশ দেখে তাঁরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন। মানি, বহু জাতিকে যুদ্ধে পরাজয় করতে হ'লে জাতির মধ্যে যে বীর্য্য, যে ঐক্য, যে রাজনৈতিক বুদ্ধি ও বন্ধনের প্রয়োজন, তার মূল্য কিছু কম নয়। কিন্তু এই বস্তুকে সভ্যতার একটা শ্রেষ্ঠ বিকাশ বল্‌লে মানুষের প্রকৃতিকেই অপমান করা হয়। আর জাতির এই বীর্য্য, ঐক্য ও বুদ্ধি যখন পরের দেশ জয় ও পরের উপর আধিপত্যেই নিঃশেষে ব্যয় হয়, তখন তার শক্তি দেখে অবশ্য স্তম্ভিত হতে হয়, যেমন কালবৈশাখীর রুদ্রমূর্ত্তিতে মানুষ স্তম্ভিত হয়। প্রকৃতপক্ষে একটা সমগ্র জাতি নবীন শক্তি সঞ্চারের আকস্মিক উন্মাদনায় নয়, কিন্তু যেমন মম্‌সেন দেখিয়েছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী সূক্ষ্ম লাভ লোকসানের হিসাব গণনা করে চোখের সুমুখে যখনি যাকে প্রবল বা বর্দ্ধিষ্ণু দেখেছে তারি বুকের উপর পড়ে, তার জীবনের বল নিঃশেষে শুষে নিয়ে নিজেকে পুষ্ট করেছে, রোমান ইতিহাসের এই ব্যাপারটি তার ভীষণতায় মানুষকে স্তম্ভিত না করেই পারে না; খৃষ্টান ও পার্শি পুরাণে যে অন্ধকার ও অমঙ্গলের দেবতার কল্পনা আছে সেটা ভিত্তিহীন নয় বলেই মানুষের বিশ্বাস জন্মায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রোমের এই প্রবল পলিটিকাল সভ্যতা, কেবল সম-সাময়িকদেরই মাথা ভয়ে হেঁট করিয়ে রাখে নি, কিন্তু উত্তর-কালের ঐতিহাসিকদেরও শ্রদ্ধায় নতমুণ্ড করে' রেখেছে। প্রাণতত্ত্ব-

বিদেরা হয় বল্‌বেন মানুষ পশুরই বংশধর ; শক্তির বিকাশ দেখ্‌লেই পূজা না করে' থাক্‌তে পারে না। মম্‌সেন বলেছেন, এথেন্স যে রোমের মত রাষ্ট্র গড়্‌তে পারে নি, সে জন্য তার দোষ ধরা মূর্খতা। কেননা গ্রীক প্রকৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও যা কিছু বিশেষত্ব, তা ছিল তেমন একটা রাষ্ট্র গড়ে' তোলার প্রতিকূল। অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে বরণ না করে', গ্রীসের পক্ষে জাতীয় একতা থেকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যে পৌঁছান সম্ভব ছিল না। সেই জন্য গ্রীসে জাতীয় একত্বের যখনি বিকাশ ঘটেছে সেটা কোনও রাষ্ট্রীয় ভিত্তির উপর ভর করে' নয়। অলিম্পিয়ার ক্রীড়াঙ্গন, হোমারের কবিতা, উরিপিডিসের নাটক এই সবই ছিল হেলাসের ঐক্য-বন্ধন। ঠিক আবার তেমনি ফিডিয়াস কি আরিস্টফেনিসের জন্ম দেয় নি বলে রোমকে অবহেলা করা অন্ধতা। কেননা রোম স্বাধীনতার জন্য স্বাতন্ত্র্যকে, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা ও শক্তিকে নির্ম্মমভাবে দমন করেছে। ফলে হয়ত ব্যক্তিগত বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে, প্রতিভার ফুলও মুকুলেই ঝরে পড়েছে ; কিন্তু তার বদলে রোম পেয়েছে স্বদেশের উপর এমন মমত্ববোধ ও 'পেট্রিয়টিজম', গ্রীসের জীবনে যার কোনও দিন প্রবেশ ঘটে নি। এবং প্রাচীন সভ্য-জাতিগুলির মধ্যে রোমই স্বাধীন রাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হয়েছে। সেই জাতীয় ঐক্যের ফলে কেবল বিচ্ছিন্ন হেলেনিক জাতির উপরে নয়, পৃথিবীর সমস্ত জানা অংশের উপর প্রভুত্ব, তাদের করতলগত হয়েছিল।

আমাদের শাস্ত্রে আছে 'পুরুষের' শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, তাই শেষ, তাই 'পরা গতি'। পরিচিত সমস্ত পৃথিবীর উপর অবাধ প্রভুত্ব কি মানব সভ্যতার 'পুরুষ', তার 'কাষ্ঠা' ও 'পরা গতি'! এ প্রভুত্ব ত

কালে উঠে কিছুকালের পরই বিলোপ হয় ; মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছুই স্থায়ী সম্পদ রেখে যায় না। আমার সুমুখে উরিপিডিসের কয়েক খানি নাটক রয়েছে। এগুলি ত কেবল খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর হেলাসের ঐক্য-বন্ধন নয়। তেইশ শ' বছর আগেকার এথেন্সের নাগরিকের মত আমিও যে আজ সে কাব্যের রসে মেতে উঠ্‌ছি। এগুলি যে চিরদিনের জন্য মানব-সভ্যতার অক্ষয় মঞ্জুষায় সঞ্চিত হয়ে গেছে। যুগের পর যুগ বিশ্বজন এর সুধা আনন্দে পান করবে, আর রোমের প্রভুত্ব ?—সেটি রয়েছে—ঐ মম্‌সেনের পৃষ্ঠায়। এ স্বস্তিপ্রভেদ, এ ত মম্‌সেনের চার ভ্যলুমও মুছে ফেল্‌তে পারে না। একে কেবল মানুষের সভ্যতার প্রকার ভেদ বলে' আপোষ মীমাংসার চেষ্টায় কোনও ফল নাই। এর একটির চেয়ে আর একটি শ্রেষ্ঠ, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ; যেমন জড়ের চেয়ে জীবন শ্রেষ্ঠ, প্রাণের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ।

মানুষের সভ্যতার ধারা দুই। এক ধারা বয়ে যাচ্ছে—কেবলই কালের মধ্য দিয়ে, জাতিকে, সভ্যতাকে ভাসিয়ে নিয়ে স্মৃতি ও বিস্মৃতির মহাসাগরে মিশিয়ে দিচ্ছে। নতুন জাতি, নূতন সভ্যতার স্রোত এসে ধারার প্রবাহকে সচল রাখ্‌ছে। আর এক ধারা জন্ম নিয়েছে কালেরই মধ্যে, কিন্তু কালকে অতিক্রম করে' ধ্রুবলোকে অক্ষয় স্রোতে নিত্যকাল প্রবাহিত হচ্ছে। নূতন স্রোত এসে এ ধারাকে পুষ্ট করছে ; কিন্তু এতে একবার যা মিশছে, তার আর ধ্বংশ নেই, তা অচ্যুত। কেননা এ লোকে ত পুরাতন কিছু নেই, সবই সনাতন, অর্থাৎ চির-নূতন। সভ্যতার সৃষ্টির এই যে নশ্বর দিকটা এ কিছু তুচ্ছ নয়। এইখানেই বিবিধ মানবের বিচিত্র লীলা, সমাজ গঠনে, রাষ্ট্র নির্ম্মাণে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, মহত্বে, হীনতায় চিরদিন তরঙ্গিত

হয়ে উঠ্‌ছে। হোক্ না এ মৃত্যুর অধীন, তবুও জীবনের রসে ভরপুর। কিন্তু মানুষ ত কেবল প্রাণ নয়। সে যে মর অমরের সন্ধিস্থল। মৃত্যুর পথে যাত্রী হয়েও সে অমৃতলোকেরই অধিবাসী। তাই তার সৃষ্টির যেটা শ্রেষ্ঠ অংশ সেটা কালের অধীন নয়। তার ইতিহাস আছে কিন্তু তা ঐতিহাসিক নয়। সেখানে যে ফুল একবার ফোটে তার প্রথম দিনের গন্ধ সুষমা চিরদিন অটুট থাকে; যে ফল একবার ফলে, রসে আস্বাদে তা চিরদিন সমান মধুর।

দুই সর্ব্বের যদি শ্রেষ্ঠত্বের মীমাংসা কর্‌তে হয়, তবে মানুষের সভ্যতার এই ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারে কার কতটা দান, তাই হ'ল বিচারের প্রধান কথা। এ মাপ কাটিতে মাপ্‌লে, রোমান সভ্যতা গ্রীক কি হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে এক ধাপে দাঁড়াতে পারে না। তাকে নীচে নেমে দাঁড়াতে হয়। যতদিন তার সাম্রাজ্য ছিল, ততদিন তার বলের কাছে —সবারই মাথা নীচু করে' থাক্‌তে হয়েছে। কিন্তু উত্তর কালের লোকেরা কেন তার কাছে সম্ভ্রমে নতশির হবে? তাদের জন্য ত সে বিশেষ কিছু সঞ্চয় করে' রেখে যায় নি। তার যা প্রধান দাবী, তার পলিটিকাল শক্তি ও বুদ্ধি, তার পাওনা ত তার সম-সাময়িকেরা এক রকম ষোল আনাই মিটিয়ে দিয়েছে। আমাদের কাছে সে দাবীর জোর খুব বেশি নয়। তার গৌরবের চৌদ্দ আনা হ'ল তার ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস জীবনের কাহিনী হলে'ও জীবন নয়, কেবলি কাহিনী। তার পৃষ্ঠার সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনও সাক্ষাৎ যোগ নাই। একজন ফরাসী পণ্ডিত রোমানদের দার্শনিক আলোচনা সম্বন্ধে বলেছেন যে, সে গুলি এখন বক্তৃতা-শিক্ষার-ইস্কুলের ছাত্রদের লেখা প্রবন্ধের মত মনে হলেও যাদের জন্য সে গুলি লেখা হয়েছিল তাদের জীবনে ওর

প্রভাব ছিল খুব বেশি। সুতরাং এ সব দার্শনিকের মূল্য বুঝ্‌তে হ'লে সেই সময়কার রোমের ইতিহাসের সঙ্গে সে সব মিলিয়ে পড়্‌তে হবে। হায় রোম, তোমার দার্শনিক চিন্তারও ইতিহাসের হাত থেকে মুক্তি নাই!

(৪)

রোমের পলিটিকাল গৌরবের গুণগান মুখে যতই কেন থাকুক না, রোমান সভ্যতার এই প্রকৃতিটি পণ্ডিতদের মনে অস্বস্তির সঞ্চার না করে' যায় নি। সেই জন্য য়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা, রোমের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের কাছে কেমন করে' কতটা ঋণী, মম্‌সেন তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং ছোট বড় মাঝারি সকল পণ্ডিতই তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। সে ব্যাখ্যার প্রধান কথাটা এই—রোম সাম্রাজ্যের প্রাচীর যদি বর্ত্তমান য়ুরোপীয় জাতিগুলির অসভ্যকল্প পূর্ব্ব-পুরুষদের ঠেকিয়ে না রাখ্‌ত, তবে তারা যখন রোম সাম্রাজ্যের উপরে পড়ে তাকে ধ্বংশ করেছিল, সে ঘটনাটি ঘট্‌ত আরও চার-শ' বছর আগে। এবং তা হলে বিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে,—স্পেনে, গলে, ড্যানিউবের তীরে তীরে, আফ্রিকায়, হেলেনিক সভ্যতার নব সংস্করণ মেডিটারে-নিয়ন সভ্যতা যে শিকড় বসাতে সময় পেয়েছিল, তা আর ঘটে' উঠ্‌ত না। আর তার ফল হ'ত এই যে, ঐ অর্দ্ধ-সভ্য জাতিগুলি যে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা গড়ে' তুলেছে, তা কখনই গড়্‌তে পার্‌ত না।

মানুষের ইতিহাসে যে ঘটনাটা এক রকমে ঘটে গেছে, সেটা সে রকম না ঘটে' অন্য রকম ঘট্‌লে তার ফলাফল কি হ'ত এ তর্ক নিরর্থক।

তাতে 'স্বপ্নলব্ধ' ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং রোম সাম্রাজ্যকে তার চৌকিদারির প্রাপ্য প্রশংসাটা নির্ব্বিবাদেই দেওয়া যাক্। কিন্তু এ ত রোমান সভ্যতার কোনও গৌরবের কাহিনী নয়! এবং রোম সাম্রাজ্যকে যাঁরা চার-শ' বছর ধরে' রক্ষা করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মুখ চেয়ে তা করেন নি! আর এটাও যদি গৌরবের কথা হয় তবে রোমকে আরও একটা গৌরবের জন্য পূজা দিতে হয়। সে হচ্ছে ঠিক সময়ে সাম্রাজ্যের প্রাচীরকে রক্ষা করতে না পারা। কেননা রোম যদি আরও চার-শ' বছর সাম্রাজ্যকে অটুটই রাখ্‌তে পারত, তবে ত আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা আরও চার-শ' বছর পিছিয়ে যেত, এবং হয় ত সে সভ্যতা আর তখন গড়েই উঠ্‌তে পার্‌ত না! ইতিহাসে তার ওজন কত, সেটা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মাপ নয়।

এই যে চার-শ' বছর ধরে' পৃথিবীর একটা বৃহৎ অংশে বিচিত্র সব জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে এল তার ফলে সৃষ্টি হ'ল কি? মেডিটারেনিয়ন সভ্যতার এই প্রকাণ্ড শূন্যতা, সমস্ত পলিটিকাল সভ্যতা, রাজ্য-জয় ও রাজ্য-শাশনের সভ্যতার, উপর এটা একটা বিস্তৃত ভাষ্য। বিস্তীর্ণ বাগানের চার পাশে পাথর দিয়ে বেড় দেওয়া হ'ল পাছে আকস্মিক বিপৎপাতে বাগান নষ্ট হয়। পাথরের দেয়াল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ল কিন্তু বাগানে ফুলও ফুট্‌ল না, ফলও পাক্‌ল না।

(৫)

রোমান সভ্যতার এই যে উচ্চ জয়গান, এ যে কেবল মিথ্যা স্তুতি তা নয়, এর কলরোল পৃথিবীর প্রবল জাতিগুলির মন চিরদিন বিপথের

দিকেই টান্‌বে। যেই যখন শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে তারি মনে হবে মানুষের বৈচিত্র্যকে ধ্বংশ করে' পৃথিবীর যতটা অংশের উপর পারা যায়, নিজের আধিপত্যের একরঙ্গা তুলিটা বুলিয়ে নেওয়া কেবল স্বার্থ সিদ্ধির উপায় নয়, সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব লাভেরই পথ। এ যে অতিশয়োক্তি নয়, তার প্রমাণ মম্‌সেন থেকেই তুলে দিচ্ছি। সিজারের গল বিজয়ের বর্ণনা মম্‌সেন এই বলে' আরম্ভ করেছেন—যেমন মাধ্যাকর্ষণ ও আর আর পাঁচটা প্রাকৃতিক নিয়ম যার অন্যথা হবার যো নেই, তেমনি এও একটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, যে জাতি রাষ্ট্র হ'য়ে গড়ে উঠেছে সে তার অ-রাষ্ট্রবদ্ধ প্রতিবেশী জাতিগুলিকে গ্রাস কর্‌বে, এবং সভ্যজাতি, বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন তার প্রতিবেশিদের উচ্ছেদ কর্‌বে। এই নিয়মের বলে ইতালীয় জাতি (প্রাচীন জগতের একমাত্র জাতি যে শ্রেষ্ঠ পলিটিকাল উন্নতির সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা মেশাতে পেরেছিল, যদিও শেষ বস্তুটির বিকাশ তাতে অপূর্ণ ভাবে এবং কতকটা বহিরাবরণের মতই ছিল) পূবের গ্রীকদের, যাদের ধ্বংশের সময় পূর্ণ হয়ে এসেছিল, তাদের করায়াত্ত কর্‌তে, এবং পশ্চিমের কেল্ট জার্ম্মাণদের, যারা সভ্যতার সিড়ির নীচের ধাপে ছিল, তাদের উচ্ছেদ সাধন কর্‌তে সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল।

প্রাকৃতিক নিয়ম যে কেমন করে' অধিকারে পরিণত হয় সে রহস্যের চাবী হয়ত হেগেলের 'লজিকে'ও মিল্‌বে না। সে যাই হোক্ এ 'নিয়ম' ও 'অধিকারের' মুস্কিল এই যে এর জন্য পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সারাক্ষণ নখদন্ত বের করেই থাক্‌তে হয়। কেননা মল্লাঙ্গনই হচ্ছে এ 'অধিকার' প্রমাণের একমাত্র স্থান। কারণ বুকের উপর চেপে বস্‌তে পার্‌লেই প্রমাণ হ'ল যে চেপে বসার অধিকার আছে; আর

তাই হল এ অধিকার প্রমাণের একমাত্র শাস্ত্রীয় প্রথা। তারপর শক্তি থাক্‌লেই যখন 'অধিকার' আছে, তখন শক্তির পরীক্ষার অধিকার থেকেও কাউকে বঞ্চিত করা চলে না। পরীক্ষা না কর্‌লে ত শক্তিটা ঠিক আছে কিনা তা আগে থেকে অমনি জানবার উপায় নেই। শেষ পর্য্যন্ত ফেল হ'লেও "হলে" ঢোকার অধিকার অস্বীকার করা যায় কেমন করে'? গেল চার বছর ধরে' এই পরীক্ষাটা সারা য়ুরোপ জোড়া চল্‌ছে। মম্‌সেনের সৌভাগ্য যে বেঁচে থেকে তাঁর প্রণালীর ফলটা দেখে যেতে হয় নি। কিন্তু প্রাচীন রোমের গুণগানে যাঁরা মুখর, আধুনিক জার্ম্মাণির উপর মুখ বাঁকানোর তাঁদের কোনও অধিকার নেই। কার্থেজ ও মিশর বিজয় যদি রোমের পক্ষে ছিল গৌরবের, তবে বেলজিয়মকে গ্রাস করা জার্ম্মাণির পক্ষে অগৌরবের কিসে? আজকার পলিটিক্সে যা হীন, কালকার ইতিহাসে তা মহৎ হয় কোন্ ন্যায়ের জোরে?

এই যে পলিটিকাল শক্তি ও সভ্যতার স্তুতিগান—এ মূলে হ'ল একটা 'মায়া'। শঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন মায়ার প্রকৃতি 'অধ্যাস',—একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ করা। পৃথিবীর আদিযুগ থেকে যখন জাতিতে জাতিতে লড়াই চলে' আস্‌ছে, আর কোন 'লীগ অব নেশনে'-ই তা শেষ হবে বলে' যখন বোধ হয় না, (কেননা 'লীগের' একটা অর্থ হচ্ছে এর ভিতরে যারা আস্‌বে না তারা শত্রু, আর বাইরে যাদের রাখা হবে তাদের এজমালীতে দমন করা চল্‌বে) তখন জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি তার আত্মরক্ষার পক্ষে অমূল্য। জাতির প্রাণই যদি না বাঁচে তবে তার মনের বিকাশও কাজে কাজেই বন্ধ হয়। কিন্তু এই শক্তি যখন আত্মরক্ষায় নয়—পর-পীড়নেই রত থাকে, রক্ষার চেষ্টায় নয়—

ধ্বংশের লীলাতেই মেতে ওঠে তখনও যে তার পূজা, তার মূলে হ'ল 'অধ্যাস'। একের গুণ আর একজনে দেখা, রামের পাওনা শ্যামকে বুঝিয়ে দেওয়া। অবিশ্যি এ দুয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট। কিন্তু একান্ত 'অবিষয়' হ'লে ত 'অধ্যাসেরও' উৎপত্তি হয় না।

(৬)

আমার এ প্রবন্ধটা যখন আগাগোড়াই অল্পবিস্তর অবান্তর রকমের, তখন নির্ভয়ে একটা খাঁটি অবান্তর কথা দিয়েই এর প্রথম প্রস্তাব শেষ করা যাক্।

ভাদ্রের 'সবুজ পত্রে' শ্রীমান চিরকিশোরের বরাবর শ্রীযুক্ত বীরবলের যে চিঠি বেরিয়েছে, তাতে জর্ম্মাণ পণ্ডিতদের 'সিসেরোর' প্রেতাত্মার গায়ে লেখনীর নিষ্ঠিবন নিক্ষেপের কথাটা তোলা হয়েছে। এবং এ কাজটাতে যে তাঁরা আণ্টনীর পত্নী 'ফুল্‌ভিয়াব' মত পতিভক্তিরই পরিচয় দিচ্ছেন, যে পতি হলেন সীজার—যিনি জার্ম্মাণিতে 'কাইজার'রূপ নিয়েছেন, তারও উল্লেখ আছে।

এই যে সিসেরো-বিদ্বেষ, আর সিজার প্রীতি, মম্‌সেনকে এ দুয়েরই এক রকম সৃষ্টিকর্ত্তা বলা চলে। তাঁর 'রোমান ইতিহাস' বের হওয়ার পর থেকেই এ দুটি মনোভাব ইউরোপে অতি মাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছে। কেননা মম্‌সেনের হাতে সিসেরোর মত "ভাষার বিদ্যুন্মণ্ডিত বজ্র" ছিল না সত্য, কিন্তু তাঁর 'ইতিহাস' হ'ল আদিম অরণ্যের প্রকাণ্ড বট। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত বাড়্‌তে বাড়্‌তে তা মনের অন্তঃস্তল ভেদ করে' এমন গভীর শিকড় ঢুকিয়ে দেয়, শাখা থেকে বহু পদ

নামিয়ে সমস্ত মনকে এমন করে' আঁক্‌ড়ে ধরে, যে তাকে মন থেকে উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে প্রায় প্রলয়ের ঝড়ের প্রয়োজন হয়। তবে আপাতত ইতালী আর ফ্রান্সে একটু একটু করে' সুর বদলাচ্ছে। কিন্তু একটা অপরাধের দায় থেকে মম্‌সেনকে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর যে সীজার স্তুতি, তা এক অদ্বিতীয় সিজার অর্থাৎ 'গোয়াস জুলিয়াস সিজার'-এরই স্তুতি। মাতৃভাষায় অনুবাদ হ'লেও 'কাইজারের' স্তুতি নয়। মম্‌সেন তাঁর 'রোমান ইতিহাসের' যে জায়গায় এ কথাটা খুলে বলেছেন তা ভাবে ও ভাষায় এমন তাজা ও চোখা যে মহামহোপাধ্যায় জর্ম্মাণ অধ্যাপকের রচনা হ'লেও সেটা 'বীরবলের' লেখাতেও চল্‌তে পারে। মম্‌সেনের সেই কয়টি কথা উদ্ধৃত করে' বক্তব্য শেষ কর্‌ব। মম্‌সেন থেকে অনুবাদ কর্‌ব না প্রতিজ্ঞা করে' পাঠকদের আরম্ভেই যে ভরসা দিয়েছি এতে সম্ভব সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা এ কটি লাইন ইতিহাসও নয়, প্রত্নতত্ত্বও নয়।

আমাদের পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু কি মহেশ্বরের যেমন সব স্তব আছে, 'জুলিয়াস সিজারের' সেই রকম একটা স্তবের পর মম্‌সেন লিখেছেন—

ঐতিহাসিকেরা সব সময়েই মনে মনে একটা কথা ধরে' নেন যেটা হয়ত একবার এখানে প্রকাশ করে' বলাই ভাল। ইতিহাসের যে নিন্দা ও ইতিহাসের যে প্রশংসা তাকে তার চারপাশের ঘটনা ও অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে' কোনও শ্রেণীবিশেষের মানুষ, কি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ নিন্দা প্রশংসা হিসাবে প্রয়োগ করা চলে না। সে চেষ্টা করে—হয় যার মগজে বুদ্ধি নাই, না হয় যার মনে মতলব আছে। সুতরাং এখানে সিজারের যে বিচার ও মূল্য নির্দ্ধারণ, সেটাকে যেন কেউ 'সিজারিয়ানিজিমের' অর্থাৎ সিজার-তন্ত্রের মূল্যনিরূপণ বলে'

চালিয়ে দেবার চেষ্টা না করে। অতীত যুগের ইতিহাস যে বর্ত্তমানের শিক্ষাদাতা একথা সত্য। কিন্তু এর এমন গ্রাম্য ও মোটা অর্থ নয় যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে গেলেই কোন না কোন জায়গায় বর্ত্তমানটাকেই হুবহু দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, এবং আজকার দিনের পলিটিকাল ব্যাধির নিদান ও ব্যবস্থাপত্র একবারে হাতে হাতেই মিল্‌বে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভ্যতার ইতিহাস কেবল তখনি শিক্ষাপ্রদ, যখন তা থেকে মানুষের সভ্যতার প্রাণশক্তিগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, যে শক্তিগুলির মূল প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক, কিন্তু যাদের সংমিশ্রণের রীতি প্রতিজায়গাতেই বিভিন্ন, এবং যখন তা মানুষকে অন্ধ অনুকরণের পথে না নিয়ে গিয়ে নবীন সৃষ্টির কাজেই উৎসাহ দেয়। এই হিসাবে সিজার ও রোমান 'ইম্পিরিয়ালিজম্'-এর ইতিহাস, তার সমস্ত ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রতিষ্ঠাতার অমানুষী প্রতিভা সত্ত্বেও, আজকার দিনের 'অটক্রেসির' যে তিক্ত ও কঠোর সমালোচনা, তেমন সমালোচনা কোন মানুষের হাতের লেখা থেকে বের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যে নৈসর্গিক নিয়মে অতি ক্ষুদ্র জীবদেহের কাছেও গঠন কৌশলের পরাকাষ্ঠায় হাতগড়া যন্ত্রের হার মান্‌তে হয়, ঠিক সেই নিয়মেই যে শাসনতন্ত্রে দেশের অধিকাংশ লোকের নিজেদের ভালমন্দ নিজেদেরই স্বাধীন ভাবে নিয়ন্ত্রিত কর্‌বার অবকাশ আছে, তা বহু বিষয়ে অপূর্ণ ও নানা দোষে দুষ্ট হ'লেও অতি ভাস্বর ও পিতৃতুল্য 'অটক্রেসি'রও তার সঙ্গে তুলনা চলে না। কেননা ওর একটির বিকাশ ও বৃদ্ধির সম্ভাবনার শেষ নাই, অর্থাৎ তার জীবন আছে; অপরটি যা তাই, অর্থাৎ মৃত। রোমান 'ইম্পিরিয়ালিজম্'-এর সেনাপতি-তন্ত্রের ইতিহাসে এই নৈসর্গিক নিয়মটির পরীক্ষা হয়ে গেছে, এবং সে হ'ল চরম পরীক্ষা। কেননা

এর সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিভার বেগে এবং সমস্ত রকম বাইরের বাধার অভাবে এ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটি যেমন অমিশ্র ও অবাধ ভাবে গড়ে' উঠতে পেরেছিল এমন আর কোথাও সম্ভব হয় নি। কিন্তু তবুও, যেমন গিবন অনেক পূর্ব্বেই দেখিয়েছেন, সিজারের সময় থেকেই রোমান রাষ্ট্রের ঐক্যটা ছিল কেবল বাইরের চাপের ঐক্য, এর গতি ছিল কলের চলা। এবং এর জীবনের রস নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়ে এর অন্তরটা তখন থেকেই হয়েছিল একবারে মৃত। যদি 'অটক্রেসির' প্রথম যুগে, এবং সব চেয়ে সীজারের নিজের মনে, রাজ-শাসনের একাধিপত্যের সঙ্গে জনসাধারণের উন্নতির স্বাধীন বিকাশের একটা মিলনের স্বপ্ন উঠে থাকে, তবে জুলিয়ান বংশের প্রতিভাশালী নৃপতিদের রাজ্য-শাসনে সে স্বপ্ন টুটতে বেশি দেরী হয় নি। আগুন আর জল এক পাত্রে রক্ষা করাটা যে কতদূর সম্ভব তার পরীক্ষাটা লোকের চোখের সামনে খুব ভীষণ রকমেই হয়েছিল। ইতিহাসে সিজারের সে কাজ তার প্রয়োজন ছিল, এবং তাতে সুফলও ফলেছিল। কিন্তু সে কাজ এমন নয় যার নিজেরই ভিতরেই কোনও মঙ্গল আছে। সেটা ছিল সমস্ত রকম সম্ভবপর অমঙ্গলের মধ্যে সব চেয়ে কম অমঙ্গল। যে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল দাসত্ব প্রথা, জন সাধারণের প্রতিনিধিমূলক শাসন যার কল্পনাতে কখনও ওঠে নি, যার প্রচলিত রাষ্ট্র-প্রণালী ছিল পাঁচ-শ' বছরের পুরাণো—যা এই আধ-হাজার বছরের মধ্যে পরিণত হয়েছিল প্রবল ও খাঁটি ধনীতন্ত্রে, সে ব্যবস্থার সামনে সিজারের সেনাপতি-তন্ত্রের একাধিপত্যই ছিল একমাত্র বাঁচবার পথ। ইতিহাসের বিচারে সিজারের 'সিজারিয়ানিজম্'-এর এই হ'ল বৈধতার দলিল। যখন ভিন্ন অবস্থা ও ভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যেও 'সিজারিয়ানিজম্'

মাথা তোলে, তখন সেটা একদিকে জবর দখল, অন্যদিকে মুখ-ভেংচান। কিন্তু ইতিহাস আসল সিজারকে তার প্রাপ্য সম্মানের এক চুল থেকেও বঞ্চিত করতে রাজী হবে না। যদিও সে জানে যে, তার বিচার শুনে, হয় ত অতিসরল ব্যক্তিরা জাল-সিজারদের সামনেও মাথা নোয়াবে, এবং অতিশঠ ব্যক্তিরা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার একটা সুযোগ পাবে। কেননা ইতিহাসও একটা বাইবেল। এবং বাইবেলেরই মত যদিও সে মূর্খকেও ভুল বোঝা থেকে বারণ করতে পারে না, এবং সয়তানকেও বচন তুলে আওড়াতে বাধা দিতে পারে না, তবুও তারি মত এ দুই ব্যক্তিকেও সহ্য করবার এবং মার্জ্জনা করবার ক্ষমতা তারও আছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

নব-বিদ্যালয়।

(ভাষা-শিক্ষা)

——:*:——

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচরণেষু।

আমরা যখন বাঙলা ভাষাকে স্কুল কলেজের ভাষা করে তোল্‌বার প্রস্তাব করি, তখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একদল লোক, আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিশ্বাস বাঙলা, বিদ্যা-শিক্ষার ভাষা হলে আমাদের ছেলেরা ইংরেজি শিখ্‌বে না। এর পাল্টা জবাব অবশ্য এই যে, তারা ইংরাজি না শিখ্‌তে পারে কিন্তু বিদ্যা শিখ্‌বে। কিন্তু এ জবাবে কারও মন ভিজ্‌বে না। আমাদের দেশের কর্ত্তাব্যক্তিরা এর উত্তরে সমস্বরে বলবেন যে, সে বিদ্যে নিয়ে কি হবে—যার সাহায্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। ইংরাজি না জান্‌লে যে ভদ্রসন্তানের 'দিন আনা দিন খাওয়া' চলে না, এ কথা আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেও জানে। ও ভাষায় অজ্ঞ হলে যে আমাদের ওকালতি, ডাক্তারি, কেরাণীগিরি, মাস্টারি, এমন কি রাজ-নীতির নেতাগিরি করাও বন্ধ হবে—এ কথা বলাই বাহুল্য। এবং এসব ক্রিয়া বন্ধ হলে বাঙালীর জীবনে আর কি কাজ থাক্‌বে? ও অবস্থায় আমরা যে ঘরে বসে সাহিত্য রচনা কর্‌ব তারও সম্ভাবনা কম। যা কথায় কথায় ইংরাজির তরজামা নয়, তা যে বাঙ্‌লা

সাহিত্য, অন্তত সাধু-বাঙ্‌লা সাহিত্য হতে পারে না, তার প্রমাণ শতকরা নিরনব্বই জন বাঙ্‌লা গদ্য লেখকের লেখায় অর্থাৎ আমাদের সকলের লেখায় নিত্যই পাওয়া যায়। অতএব ইংরাজি না শিখ্‌লে যে বাঙ্‌লার সর্ব্বনাশ হবে, এ বিষয়ে দ্বি মত নেই—এবং থাক্‌তে পারে না। তবে বাঙলা না শেখাটা ইংরাজি শিক্ষার সদুপায় কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির প্রসাদে দেশের লোক যে ইংরাজি শিখ্‌ছে—ইংরাজি নবিশদের এই ধারণাটি অনেকটা অমূলক। পাঁচ বৎসর বয়েস থেকে সুরু করে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে'—আমাদের বিদ্যার্থীরা যে, ইংরাজি ভাষার উপর কতটা অধিকার লাভ করে, তার পরিচয় যিনি কখন B. L. পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করেছেন, তিনিই পেয়েছেন। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে যাঁদের হাতে উকিলের সনন্দ দিয়ে বিদায় করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন সাধু-ইংরাজি লেখা দূরে থাক্‌ শুদ্ধ ইংরাজিও লেখেন না, শতকরা পঁচিশজন লেখেন বাবু-ইংলিশ, আর শতকরা দশজন যা লেখেন, তা দিনেমার ওলন্দাজ কিম্বা আলেমানের ভাষা হতে পারে—কিন্তু ইংরাজের নয়; অথচ এঁরা সকলেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট! এত দীর্ঘকালব্যাপী ইংরাজি ভাষার এই একাগ্র চর্চ্চা এতটা বিফল হয় কেন? বাঙালী জাতি সরস্বতীর কৃপায় বঞ্চিত নয়, তবে আমাদের যুবকদের মধ্যে শিক্ষার এই ব্যর্থতার কারণ কি?—কারণ এই যে, পাঁচ বৎসর বয়েসে ছেলেরা ইংরাজি ধরে এবং পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত তারা দিবারাত্র এক ঐ ইংরাজিরই চর্চ্চা করে।

সকল শিক্ষার মত, বিদেশীভাষা শিক্ষাও কাল ও পাত্র সাপেক্ষ। শৈশব এ শিক্ষার উপযুক্ত কাল নয়, বালক এ শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র নয়। শিশুর দেহের পক্ষে মাতৃদুগ্ধ যা, বালকের মনের পক্ষে মাতৃভাষাও তাই। অর্থাৎ মাতৃভাষার সাহায্য বিনা বালকের মন গড়ে ওঠে না। ছেলেরা যে ভাষা অষ্টপ্রহর শোনে, আর যে ভাষায় অষ্টপ্রহর কথা কয়, সেই ভাষার সাহায্যেই তারা পরের কথা বুঝতে ও নিজের কথা বোঝাতে শেখে। ছেলের মন ও ছেলের ভাষা, ও দুই হচ্ছে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ; সুতরাং এ দুই এক সঙ্গে যেমন বেড়ে ওঠে তেমনি গড়ে ওঠে। তারপর অন্তপ্রকাশ করবার চেষ্টাতেই মানবসন্তানের ভাষার উপর যথার্থ অধিকার জন্মে এবং সেই সঙ্গে মনের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। শিশুর দেহের সঙ্গে তার মন এবং তার মনের সঙ্গে তার স্বভাষা-জ্ঞান যে এক রকম স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে ওঠে, এ কথা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। অপরপক্ষে বিদেশী ভাষা, সজ্ঞানে শিখ্‌তে হয়; সুতরাং তা শেখ্‌বার জন্য সেই মন চাই—যে-মন বালকের নেই। বারো বৎসর বয়েসের পূর্ব্বে বিদেশী ভাষা শেখ্‌বার চেষ্টাটা ছেলেদের পক্ষে যে, শুধু কষ্টকর ও ব্যর্থ, তাই নয়—তার মনের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকর। মদ্য মাংস সেবন ছোট ছেলের দেহের পক্ষে যতটা উপকারী, একটি বিদেশী ভাষার চর্চ্চা ছোট ছেলের মনের পক্ষে তার চাইতে বেশি উপকারী নয়। আমরা ছোট ছেলেদের তা গিলিয়ে দিতে পারি কিন্তু তা জীর্ণ করবার শক্তি তাদের নেই। ফলে অল্প বয়েসে ইংরাজি শিখ্‌তে গিয়ে, আমাদের ছেলেরা ইংরাজিও ভাল করে আয়ত্ব করতে পারে না এবং লাভের মধ্যে শুধু মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মন ছেলেবেলায় বিদেশী ভাষার চাপে জড় হয়ে

পড়ে, সে মন কৈশোর ও যৌবনে তার পূর্ণশক্তি লাভ করতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ যুবকদের মনের যে দম ও কশ নেই, তার একমাত্র কারণ আমাদের এই সৃষ্টিছাড়া শিক্ষা-পদ্ধতি। কিন্তু ইংরাজি শেখাটা আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্য এতই প্রয়োজন, যে আমাদের সমাজের যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক একবাক্যে বল্‌বেন,—হোক আমাদের ছেলেরা মনে পঙ্গু, তাদের ঐ পাঁচ বছর বয়েস থেকেই A. B. C. শিখ্‌তে হবে, নচেৎ তারা বয়েসকালে ইংরাজি-নবিশ হতে পার্‌বে না। না ভেবেচিন্তে কথা কওয়াটা, বিশেষত সেই সব বিষয়ে—যে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ—আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কেননা অপর দেশের শিক্ষার প্রণালী এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে এঁরা যদি কিছু খোঁজ খবর রাখতেন, তাহলে এঁরা এ কথা জান্‌তেন যে, বারো বৎসর বয়েসের পরে, অর্থাৎ মাতৃভাষার উপর যথেষ্ট পরিমাণে অধিকার লাভ কর্‌বার পরে, ছেলেরা দু-তিন বৎসরে বিদেশী ভাষা যতটা আয়ত্ত্ব করতে পারে, পাঁচ বৎসর বয়েস থেকে সুরু করে তারপর দশ বৎসরের অবিরাম চর্চ্চায় তার সিকির সিকিও পারে না। এই কারণে নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের বারো বৎসর বয়েসের আগে মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষার সংশ্রবে আস্‌তে দেওয়া হয় না। এদেশেও পুরাকালে উপনয়নের পরই সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

অতএব ভাষা শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে—মাতৃভাষা শিক্ষা। মাতৃভাষাও যে একটা শিক্ষার বিষয়, এ জ্ঞান আমরা হারিয়ে বসে আছি। আমাদের ধারণা, এ বিষয়ে বাঙালীমাত্রেরই অশিক্ষিত পটুত্ব আছে। সে পটুত্ব যে বেশির ভাগ লোকের নেই, তা তাঁরা

বাঙলা লিখ্‌তে বস্‌লে অবিলম্বে আবিষ্কার করতে পারেবন। সাহিত্যে আমাদের তুল্য মুখচোরা জাত যে অপর কোনও সভ্যদেশে নেই, তার কারণ আমাদের শিক্ষার গুণে আমরা আশৈশব আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাই নি। স্কুলের ছেলের পক্ষে স্বচ্ছন্দে ইংরাজিতে আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব এবং বাঙলাতে করা বারণ। এর ফলে আমাদের অধিকাংশ লোকের ভাষাজ্ঞান ছোট ছেলের জ্ঞানেরই সমতুল্য, খাওয়া-পরা চলা-ফেরার জন্য যতখানি ভাষাজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য যে ক'টি কথা না জান্‌লে নয়, আজকের দিনে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী সেই ক'টি নিত্য ব্যবহার্য্য কথাই অক্লেশে ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের অন্তরে মাতৃভাষার ভিৎ আছে কিন্তু সে ভিৎ এত কাঁচা যে, তার উপর কি-দেশী কি বিলেতি কোনও পাকা ভাষার ইমারৎ খাড়া করা যায় না। অতএব মাতৃভাষা যদি আমরা শিক্ষা করি, তাতে করে ইংরাজি-শিক্ষার কোনও ক্ষতি হবে না; উপরন্তু, আমাদের মন সবল, সুস্থ এবং স-ক্রিয় হয়ে উঠ্‌বে। তখন আমাদের আর, এ বলে দুঃখ করতে হবে না যে, দেশে এত বিদ্যে আছে অথচ তা দেশের কোনও কাজে লাগে না। পৃথিবীর দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যের সকল বিদ্যা যে আমাদের মনের চক্রব্যূহে ঢুক্‌তে পারে কিন্তু বেরুতে পারে না, তার কারণ আত্মপ্রকাশের সহজ পথটিই আমরা বাল্যকালেই ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।

মাতৃভাষাও শিক্ষা করবার জিনিষ, কিন্তু তাই বলে যে উপায়ে যে পদ্ধতিতে আমরা একটি বিদেশী অথবা একটি মৃতভাষা শিক্ষা করি, সে উপায় সে পদ্ধতি, মাতৃভাষা শিক্ষার পক্ষে আবশ্যকও নয়—

উপযোগীও নয়। বিদ্যারম্ভেই অমরকোষ ও মুগ্ধবোধ কণ্ঠস্থ করাই হয়ত সংস্কৃত শেখার সহজ উপায়, কিন্তু ব্যাকরণ অভিধানের সাহায্যে কাউকেও মাতৃভাষা শিখ্‌তে হয় না; সুতরাং ও উপায় অবলম্বন করতে শিশুদেরও বাধ্য করা অসঙ্গত। যে উপায়ে ছেলেরা ভাষা নিজে শেখে, সেই উপায় অবলম্বন করেই তাদের ভাষা শিক্ষা দিতে হবে, অতএব এ শিক্ষার গোড়ায় ব্যাকরণ অভিধানের কোনও স্থান নেই। বিদেশী ভাষা শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে, বিদেশী শব্দের স্বদেশী প্রতিশব্দ শেখা। কিন্তু মাতৃভাষার গোড়াকার শিক্ষা হচ্ছে—বস্তুর সঙ্গে তার নামের, বাচ্যের সঙ্গে তার বাচকের সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করা। ছেলেরা গ্রন্থ কিম্বা গুরুর সাহায্য না নিয়ে, আপনা হতেই যে-সব কথা শেখে, সেই শব্দসংগ্রহই হচ্ছে সব ভাষারই মূল উপাদান, এই উপাদান করায়ত্ত না করতে পার্‌লে, ভাষার উপর পূর্ণ অধিকার জন্মে না, এবং একটি বিদেশী-ভাষা শেখার মুস্কিলই এই যে, সে ভাষার মূল উপাদানের পুঁজি নিয়ে আমরা তার বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করতে বসি নে। সুতরাং মাতৃভাষার শিক্ষা লেখাপড়া দিয়ে সুরু করবার দরকার নেই, অর্থাৎ হাতে খড়ি দেওয়াটা বিদ্যারম্ভের প্রথম ক্রিয়া নয়। নব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির বিস্তারিত পরিচয় বারান্তরে দেব।

১লা অক্টোবর, ১৯১৮।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।